ক্ষুদ্রতর গবেষণা সন্দর্ভের প্রতিবেদন

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সমসাময়িক সময় ও সমাজের প্রতিফলন ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

Anandaram Dhekial Phookan College Library
Acc. No R.23
Date.....
Nagaon · Assam

ज्ञान - विज्ञानं विमुक्तये

Sponsored by

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

North-Eastern Regional Office
Guwahati

Submitted by

NIPON DAS
Assistant Professor
Department of Bengali
ADP College, Nagaon-782002 (Assam)

প্রাককথন

সাহিত্যের জন্ম হয় সময় ও সমাজের যুগ্ম মিলনে। উপন্যাস-ছোটোগল্পের মতো নতুনতর সাহিত্যশাখায় সময়-সমাজের প্রভাব আরো বিশেষভাবে দৃশ্যমান। বিষয় নির্বাচনে, বিষয় বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে, চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সংযোগে এবং সর্বোপরি এইসবের পরিপ্রেক্ষিতরূপে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্বাসযোগ্য রূপায়ণের মধ্যে সেই প্রভাব কথাসাহিত্যের নানাস্তরে ছড়িয়ে যায়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির বৃহত্তর বাতাবরণেই মানুষের স্থিতি। কিন্তু এই সাধারণ সত্য কখনো আবার তীব্রতর মাত্রায় বদলে যায়। বিস্ফোরক সমাজ-রাজনৈতিক উত্থান-পতনে আন্দোলিত হতে থাকে তার সৃজনস্বভাব। যেমন দেখা গেছে বাংলাদেশে বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে। রাজনীতির নানামুখী প্রসারের চাপ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যকে কীভাবে এবং কতোভাবে প্রভাবিত করেছিল — তা বুঝে নেওয়ার অভিপ্রায়ে আমাদের এই অধ্যয়ন।

আমি 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (UGC)-র আর্থিক সহায়তায় 'ক্ষুদ্রতর গবেষণা সন্দর্ভ' প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষত আর্থিক সাহায্যের জন্য কমিশনের কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞতায় ঋণবন্দী।

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড° সরিফ উদ্দিন আহমেদ, বর্তমান অধ্যক্ষ ড° সুরজিৎ কুমার ভাগবতী, বাংলা বিভাগের প্রধান ড° অজিত কুমার সিংহকে। যাঁদের সতর্ক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি-অনুপ্রেরণা আমাকে এই গবেষণা কর্মে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

এ ছাড়া যাঁরা নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ জুগিয়েছেন অনবরত, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ের অসমিয়া বিভাগের অধ্যাপক ড° জলিন চেতিয়া, গ্রন্থাগারিক ঋষিকেশ ভূঁঞা। এঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

স্ত্রী অস্পিতা সাংসারিক দায়বদ্ধতা থেকে রেহাই দিয়ে গবেষণায় সাহায্য করেছেন। ওঁকে জানাই ভালোবাসা। চার মাসের ছেলে আদিকৃৎ আমার সকল কর্মের অনুপ্রেরণা। ওর প্রতি থাকল স্নেহ ও আশীর্বাদ।

সূচিপত্র

ভূমিকা			পৃ. ১ - ২
প্রথম অধ্যায়	ঃ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন	পৃ. ৩ - ১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	পৃ. ১৯ - ২৫
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন	পৃ. ২৬ - ৬২
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার শৈলী	পৃ. ৬৩ - ৬৯
উপসংহার	ঃ		পৃ. ৭০
গ্রন্থপঞ্জি	ঃ		পৃ. ৭১ - ৭৩

ভূমিকা

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য মূলত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ছবি। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। ভারত উপনিবেশ বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে দেখেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখরাঙানি আর স্বাধীন ভারতবর্ষ। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে শুনেছে রাজনৈতিক নেতাদের শ্লোগান, বুঝেছে শাসকের চেহারা পালটালেও শোষণের ধরণ একই থেকেছে। নানা চাপান-উতোর, যুদ্ধ ও শীতল যুদ্ধের ভয় ও উত্তেজনা, মন্বন্তর-দাঙ্গা, দেশভাগের রক্ত ও মৃত্যুর মিছিল, জমির অধিকার ও খাদ্য আন্দোলন— বিশ শতক জুড়ে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক সমান্তরাল জীবন যাপন করেছে মানুষ। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, প্রেম-অপ্রেম, যৌনতা ও যান্ত্রিকতা, আদর্শ ও অবক্ষয়ের টানাপোড়েনে বোনা এই শতকের জীবন। স্বভাবত বিশ শতকের কথাসাহিত্যও এই জীবনসম্ভব, এই জীবনাশ্রয়ী। কথাসাহিত্যের বিশেষত বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে উক্ত সময়ের বৈশিষ্ট্য সমূহ প্রকাশ পেয়েছে— আমরা তা দেখার চেষ্টা করব। আমাদের আলোচ্য গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)।

আমাদের আলোচ্য দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি বিশ শতকে পাঁচের দশকের মাঝামাঝি লেখা শুরু করেছিলেন। এ-সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত গল্পকার হলেন — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। বলা যায় বাংলা ছোটোগল্পের আসরে এ-সময় মিলন ঘটেছে কয়েকজন শিক্ষিত-প্রতিভাবান গল্পকারের। উক্ত গল্পকাররা দেশপ্রেম-বিপ্লব-পেশাগত সাফল্যে আস্থা হারিয়ে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভেসে-চলা এক জীবনের প্রতি। নিতান্ত ব্যক্তিক খেয়ালে মধ্যবিত্তের 'Respectibility'-র জীবনদর্শনকে আঘাত করাই ছিল এঁদের আগ্রহ।

আবার এই পর্যায়েই গল্পের একটা ভিন্ন সুর ধরা পড়ে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। এ-সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গল্পে যে জীবনবিচ্ছিন্ন ছবি তৈরি করেছিলেন — দীপেনের গল্প তা থেকে একেবারেই আলাদা। তাঁর প্রথম দিকের গল্প 'বৃত্ত' বা 'গ্রহণ'-এ তিনি যেন কিছুটা পূর্বসূরিদেরই অনুগামী। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের লাঞ্ছনা কথনেই ছিল তাঁর আগ্রহ। এই শতকেরই পঞ্চাশের দশকে দীপেন্দ্রনাথের গল্পে ভিন্ন সুর দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণা থেকে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রদের নিষ্ক্রমণের পথ দেখান রাজনীতির মাধ্যমে। কেননা তিনি জেনেছিলেন বিচ্ছিন্নতায় নয়, সংযোগেই মুক্তি। এ-সময় তাঁর গল্পে দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ, সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সমস্যা, গ্রামবাংলার ছবি উঠে আসতে থাকে।

কথাসাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে বাংলা সাহিত্যের সম্ভারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজ বস্তুত বুদ্ধি প্রাধান্যের মেজাজ। নাগরিক যুবমনের দ্বিধা-সংকট-আশ্রয়হীনতা তাঁর গল্পের বিষয়। আবার এই সংকটাপন্ন কালেই তিনি প্রবল রাজনৈতিক বিশ্বাস ও গভীর মানবিক মমতা নিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন।

প্রণালিবদ্ধ আলোচনার জন্য অভিসন্দর্ভটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুমাত্রিক ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন। বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক ছিল মূলত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সময়। এ সময়েই দীপেন্দ্রনাথের মূল্যবান গল্পগুলো রচিত হয়েছিল। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দীপেন্দ্রনাথের গল্পের প্রেক্ষাপট। আর এই প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করেই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে দীপেন্দ্রনাথের কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। দীপেন্দ্রনাথের গল্পের ভাষা-বিষয়বস্তু-আঙ্গিক হামেশাই স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। এই দাবিকে মান্যতা দিয়েই চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তাঁর গল্পের শৈলী।

প্রথম অধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন

কথাসাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১০-ই নভেম্বর। কলকাতার এন্টালি অঞ্চলে। তাঁর পিতার নাম ছিল ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা নলিনী প্রভা দেবী। পাঁচ ভাই তিন বোনের পরিবারে তিনি ছিলেন চতুর্থ।[১] তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবনের বেশি ভাগ সময়ই কেটেছে উত্তর কলকাতায়। বিশেষত শিয়ালদা-বৌবাজার এলাকার মধ্য কলকাতায়। পরে তাঁরা নিউ আলিপুরে নিজেদের বাড়িতে চলে আসেন। অবশ্য কলেজে ভর্তির পর শুধু ওই অঞ্চলটুকুই নয়, সারা কলকাতা শহরই ঘুরে বেড়াতেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনো ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রে। কখনো আবার নিতান্তই সাহিত্যিক আড্ডার টানে। ফলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে কলকাতা শহর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। আজন্ম কলকাতার বাসিন্দা দীপেন্দ্রনাথের একটি শিকাড় অবশ্যই রয়ে গেছে পূর্ববাংলায়। তবে ওই দেশে তিনি খুব বেশি যান নি। ছোটোবেলায় পরিবারের লোকজনের সঙ্গে একবার গিয়েছিলেন। তাছাড়া গিয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভের পর। আরো একবার গিয়েছিলেন ১৯৭২-এ, স্বাধীন বাংলাদেশে।[২]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল জীবন শুরু হয় কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। এরপর তিনি চলে যান দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। জনৈক সমালোচক বলেছেন—

> "বিদ্যাপীঠে দীপেন্দ্রনাথ নানারকম সাংস্কৃতিক কাজে অংশ নিতেন ও উঁচু ক্লাসে নেতৃত্ব দিতেন। কিশোর দীপেন্দ্রনাথ এই বিদ্যাপীঠেই একটি হাতেলেখা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। বলা যায়, দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনা কর্মের এখানেই হাতে খড়ি। বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসীগণ দীপেন্দ্রনাথকে তাঁর সাহিত্য কর্মেও নিয়ত উৎসাহ দিতেন। স্বামীজিদের কারো কারো প্রভাব তাঁর জীবনে বেশ গভীরভাবেই পড়েছিল। ... তখনকার অনেক স্বামীজি পরেও দীপেন্দ্রনাথের খোঁজ-খবর রাখতেন — এখন তিনি নাস্তিক ও মার্কসবাদী জানা সত্ত্বেও।"[৩]

রামকৃষ্ণ মিশনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলেও প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে ফাইনাল পাশ করে দীপেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।[৪] ১৯৫৪-তে প্রেসিডেন্সি থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে তিনি স্কটিশাচার্চ কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। দীপেন্দ্রনাথের স্ত্রী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "১৯৫৪ সালে Intermediate পাশ করে English-এ Hons. নিয়ে Scottish church college-এ ভর্তি হয়েছি। Presidency থেকে Intermediate করে বাংলায় Hons. নিয়ে দীপেন এসেছেন Scottish-এ।"[৫]

১৯৫৬ সালে স্নাতক দীপেন্দ্রনাথ ভর্তি হন Calcutta University-তে। ১৯৫৮ সালে তিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর স্ত্রী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "Scottish থেকে Calcutta University। সেই সময় Scottish-এর through দিয়ে Calcutta University-তে ভর্তি হবারও নিয়ম ছিল। মাইনে দেবার counter scottish-এ, ক্লাশ Calcutta University-তে। আমি সেই ভাবেই হই। সম্ভবত দীপেনও। ... ১৯৫৬ সালে graduation-এর পর ঠিকানা Calcutta University ... 1958-এ দীপেন M.A. পরীক্ষা দিলেন, আমি সে বছর drop করে 1959-এ।"[৬]

সাহিত্য ও রাজনীতির যুগ্ম পরিবেশের মধ্যেই দীপেন্দ্রনাথের কলেজজীবনের প্রথম দুবছর কাটে। তখনই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্ত হন। আত্মনিয়োগ করেন ছাত্র সংগঠন গড়ার কাজে। ১৯৫৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট দলের সদস্যপদ লাভ করেন। কলকাতায় তখন রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও জোয়ার বইছিল। সে-সময় দীপেন্দ্রনাথ প্রায় প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

> "বাহান্ন থেকে বাষট্টি পর্যন্ত যুগটি ছিল সমস্ত বঙ্গবাসীর মনোজগত প্রবলভাবে আলোড়িত হওয়ার, উদ্বেলিত ও উদ্বুদ্ধ হওয়ার কাল। এবং নিদারুণ আশাভঙ্গেরও কাল। দীপেন্দ্রনাথ তখন কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছেন। তিনি পার্টি সদস্যপদ পান ১৯৫৪-তে। তাঁর প্রাণের অধিক পার্টি তখন এগোচ্ছে,

বাড়ছে, ক্রমাগত বড় হচ্ছে। লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে তাঁর চারপাশে চলছে গণ-আন্দোলনের জোয়ার। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে, বঙ্গবিহার সংযুক্তি ঠেকাতে, গোয়াকে মুক্ত করতে, কলেজে ছাত্রবেতনবৃদ্ধি রুখতে, কেরলে বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে, আফ্রিকার নানা দেও ও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংহতিতে, কিউবার বিপ্লবের সমর্থনে, মিছিলে মিছিলে কলকাতা তখন কাঁপছে। নেহরু কলকাতাকে একটা নতুন নামই দিয়ে দিলেন, 'মিছিলের শহর'।"[৭]

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ দীপেন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এর মাধ্যমে তিনি মেহনতি মানুষের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন রাজনীতি জীবনেরই একটি অংশ। মানুষের প্রেম-ভালোবাসা-সমাজনীতি-অর্থনীতি-রাজনীতির একটিকে বাদ দিয়েও জীবন সমগ্র নয়। তাঁর সাহিত্যের চরিত্ররাও এই সমস্ত সত্তার রসায়নে সামগ্রিক জীবনসত্তার চিত্রায়ণ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের শিকড় রয়েছে তাঁর পরিবারের মধ্যেই। পারিবারিক রাজনৈতিক আবহের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন—

"পিতামহ বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতা ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনীতি করেছেন। তাঁর ছোটপিসি পুরবী মুখোপাধ্যায় এবং দিদি মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁরা এম.এল.এ. ও মন্ত্রীও হয়েছিলেন।"[৮]

এরকম রাজনীতি-সচেতন পরিবারের সন্তান দীপেন্দ্রনাথের রক্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ছিল রাজনীতির সুপ্ত চেতনা। কিন্তু মতাদর্শগত দিক থেকে দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন আলাদা। তাঁদের কংগ্রেসি রাজনীতি-সচেতন পরিবারে একমাত্র তিনিই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। দীপেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবন ও বিশ্বাসে তাঁর পরিবারের সমর্থন ছিল না। দেবেশ রায় জানিয়েছেন—

"... এই পরিবারের একটি সন্তান, যাকে ঘিরে সবার আনন্দ ও গৌরব, সে কুড়ি বছর বয়সে কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়া পরিবারের মধ্যে এক বিপুল ভাঙন আর সেই সন্তানটির পক্ষে এক স্বেচ্ছানির্বাসন। ঐ পরিবার ছেড়ে

কেউ বেরিয়ে যেতে পারে না। যাঁরা চাকরীর জন্য বা অন্য কোনোও কারণে বাইরে গেছেন, তাঁরাও ফিরে ফিরে এসেছেন। দীপেনও বারবার চেষ্টা করেছে বেরিয়ে যেতে। বারবার ফিরে গেছে বাড়িতে। অতটা সক্রিয় কংগ্রেসি বাড়িতে, অতটা সক্রিয় তরুণ কোনও কমিউনিস্ট থাকতে পারে না। অথচ ওরকম একটা পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেও ফেলা যায় না।"[৯]

তাছাড়া কমিউনিস্ট দীপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

"সেই আলোতেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর চারপাশের জীবনের খর্বতা, ক্ষুদ্রতা আর বিকৃতি। বিচলিত এবং পীড়িত হয়েছিলেন তিনি। সমাজ ও জীবনের এই বিকৃতিকে পরাস্ত করার এবং সংশোধন করার পথ খুঁজতেই হয়েছিল তাঁকে। খুঁজতে খুঁজতেই একসময় পেয়েছিলেন তাঁর পথ, সাম্যবাদী আদর্শ এবং সেই আদর্শকে সত্য করে তোলার সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টিতে আসা, পার্টির সদস্যপদ-প্রাপ্তি ছিল তাঁর জীবনে এক মস্ত ঘটনা। নিজের উত্তরণের লড়াই এবং সমাজ বদলের যুদ্ধ তাঁর কাছে আর আলাদা নয়, এক এবং অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্যই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনেক লেখাতে তাঁর সমাজ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও চরিত্র হয়ে ওঠেন, কত অনায়াসে, কেমন অনিবার্যভাবে।"[১০]

স্কটিশ চার্চ কলেজেই দীপেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে শ্রীমতী চিন্ময়ী বালার সঙ্গে। ১৯৬০ সালে তাঁরা আবদ্ধ হন বৈবাহিক বন্ধনে। তাঁদের দুজনকেই প্রবল বাধা পেরিয়ে পরস্পরের কাছে আসতে হয়েছিল। ব্যক্তিজীবনের প্রেম ও দাম্পত্যের ছায়াপাত ঘটেছে দীপেন্দ্রনাথের রচনায়ও। বিয়ের দুবছর পর তাঁদের কন্যা মৃত্তিকার (ডাক নাম ঝুম্পা) জন্ম হয়। দশ বছরের মাথায় জন্ম হয় পুত্র মেঘেন্দ্রনাথের। চিন্ময়ী দেবী এ-বিষয়ে জানিয়েছেন—

"1960-তে আমাদের বিয়ে, registration এবং সামাজিক অনুষ্ঠান। সংসারে আপ্লুত হবার পরিকল্পনা না থাকলেও কার্যত তা হতে হয়। 1962-তে আমাদের কন্যা এবং 1970-এ পুত্রের জন্ম।"[১১]

দীপেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন কেটেছে উত্তাল রাজনীতিতে ও সাহিত্যে। ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠন, যুব আন্দোলন ও বিভিন্ন যুব উৎসবের সাহিত্য-সংক্রান্ত অধিবেশনের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। পঞ্চাশের

দশকে বামপন্থী রাজনীতিতে উত্তাল পশ্চিমবাংলার ছাত্রজীবনের আলেখ্য পাওয়া যায় তাঁর ১৯৫৭ সালে লেখা 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে। পরিচয়ের সম্পাদক জানাচ্ছেন—

> "স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র আন্দোলনের ধারাতেই বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ... তাঁর রাজনৈতিক জীবনও ছিল প্রধানত ছাত্র-আন্দোলন ও কলকাতাকেন্দ্রিক। ... বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত, সাহিত্য-আন্দোলন ও রাজনীতি সব দিক থেকেই সহযাত্রী দেবেশ রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ১৯৫৬-৫৭ সালে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়ে যে আত্মসচেতনার আন্দোলন শুরু হল, দীপেন্দ্রনাথ তাঁর কমিউনিস্ট প্রত্যয় নিয়ে তাকে নিছক প্রকরণের চর্চা থেকে উত্তীর্ণ করে বিষয়-অন্বেষণের গতিমুখে স্থাপন করেন।"[১২]

১৯৬২ সালে দীপেন্দ্রনাথের কন্যা মৃত্তিকার জন্ম হয়। এই সময় তিনি তাঁদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে মনোহর পুকুর রোডে একটি একতলা ভাড়া-বাড়িতে উঠে আসেন। এই বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর দীপেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় চীনের ভারত আক্রমণ ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙন দীপেন্দ্রনাথকে বিধ্বস্ত করে দেয়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরও বহুদিন তাঁকে গৃহবন্দী থাকতে হয় অসুস্থতার জন্য। জ্যোতিপ্রকাশ জানাচ্ছেন—

> "পার্টির প্রতি যাঁর এত ভালবাসা, এমন কমিটমেন্ট এবং ডেডিকেশন, তিনি কেমন করে সইবেন পার্টির ভাঙন? বাষট্টি থেকেই ভাঙতে শুরু করেছিল পার্টি (আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ হয় চৌষট্টিতে)। তাঁর সবচেয়ে মহার্ঘ, নির্ভরযোগ্য, প্রয়োজনীয় এবং প্রাণের চেয়ে প্রিয় রণপাটি ভেঙে গেল। আর কার ওপর ভর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটবেন? রণপাটি ভেঙে যেতেই যেন মুখ থুবড়ে পড়লেন তিনি। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মানসিক ভারসাম্য এমনভাবে হারিয়ে ফেললেন যে চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হলো। তারপরেও দীর্ঘদিন অন্তরীণ করে রাখতে হলো বাড়িতে।"[১৩]

'পরিচয়' মাসিকপত্রের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের যোগ তাঁর কলেজজীবন থেকেই। 'পরিচয়'-এর কর্মী হিসেবে তিনি সক্রিয় হন ১৯৫৯ সাল থেকে। সেই সময় থেকেই তিনি 'পরিচয়'-এর অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩-তে সাময়িক অসুস্থতার জন্য তাঁর সঙ্গে বাইরের জগতের কোনো

সম্পর্ক ছিল না। প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তিনি আবার ১৯৬৮-তে 'পরিচয়'-এর সম্পাদনা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন অপর সম্পাদক তরুণ সান্যাল। ১৯৭৬-এর মে সংখ্যা থেকে দীপেন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর একক সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১৪] এবং আমৃত্যু তিনি এই সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে গেছেন—

> "১৯৬৩ সালে সাময়িক অসুস্থতার ফলে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু যে মহাকাব্যিক মানবিক বীরত্বে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর শারীরিক বাধা অতিক্রম করেছিলেন, তারই জোরে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর মানসিক বাধাও সামলে ওঠেন। ১৯৬৮-তে আর শুধু সহ-সম্পাদক নন; 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।"[১৫]

দীপেন্দ্রনাথ বরাবরই সম্পাদনার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়েও উদার মন নিয়ে নতুন নতুন লেখক খুঁজে বের করেছেন। বানান ভুল তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে ফাইনাল প্রুফটাও তিনি দেখতেন। পত্রিকা অথবা বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব নিখুঁত করার ওপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। সম্পাদনার কাজে ছিল তাঁর অসামান্য ধৈর্য। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা কিংবা রিপোর্টাজধর্মী কোনো রচনা— প্রত্যেকটি তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। এমনকী কোথাও কোনো যতিচিহ্নের ব্যতিক্রমও তিনি বরদাস্ত করতেন না। একদিকে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। একইসঙ্গে আবার 'কালান্তর'-এর রবিবারের পাতা আর শারদ সংখ্যা সম্পাদনার কাজ তিনি অবলীলায় চালিয়ে গেছেন। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "... দ্বিতীয় ঘটনা দীপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র 'একতা'-র প্রকাশনা। একতা-র কাছে পাঠকদের চিরকালই কিছু প্রত্যাশা থাকে। সেবারের সংখ্যাটি সব প্রত্যাশার সীমা ভেঙে দিল। পরিকল্পনার সাহসে, লেখার মানে, শ্রম আর যত্নের প্রমাণে। সম্পাদনার কাজে তিনি চিরকালই — বাল্যকাল থেকেই — সিদ্ধহস্ত। কাজটা তাঁর প্যাশন। একেবারে ছোটবেলায়, রোগশয্যা থেকেও, একদিকে যেমন নিজের লেখা লিখেছেন, তেমনি সম্পাদনা করেছেন নিজের পত্রিকা — সবুজের অভিযান। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে বের করেছেন উজান। কিন্তু 'একতা'-র

সম্পাদনাতেই পরিণত, পরিপক্ক একজন সম্পাদক এসে দাঁড়ালেন সামনে, যাঁকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতেই দেখা গেল পরের যুগে 'পরিচয়'-এর সহসম্পাদক হিশেবে, যৌথ ও একক সম্পাদনার দায়িত্বে, শারদীয় 'কালান্তর' ও নানা ধরনের সংকলন সম্পাদনার কাজের মধ্য দিয়ে। প্রায় বিশ বছর ধরে এই কাজে তিনি যে-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনায়াসেই তাঁকে বাংলা পত্রপত্রিকার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকের সারিতে স্থান করে দিয়েছে।"[১৬]

ষাটের দশকের শেষেরদিকে দীপেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'কালান্তর' পত্রিকায় যোগ দেন। প্রথম থেকেই তিনি 'কালান্তর'-এর সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করতেন। এই সময় বাঁকুড়ায় প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। দীপেন্দ্রনাথকে সেখানে পাঠানো হয় খরাজনিত পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট লেখার জন্য। এখান থেকেই দীপেন্দ্রনাথের সাংবাদিক জীবনের সূচনা।[১৭] এরপর তিনি বহু রিপোর্ট লিখেছেন। 'ঘোড়েওয়ালা বাবু', 'আমি ইন্ডিয়া', 'থানা থেকে আসছি', 'নো-পারসন' ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন রিপোর্টগুলো তাঁর সাংবাদিক-জীবনের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—

"সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ঘোড়েওয়ালা বাবু' পড়ার জন্য পাঠকমহল সাগ্রহে অপেক্ষা করত। অনিবার্য কারণে কটা ইস্যু ছেদ পড়ে যাওয়ায় 'কালান্তর' দপ্তরে এক গাদা চিঠি এসে পৌঁছত। সব চিঠিতে দীপেনবাবুর এই লেখাটির জন্য থাকত তাগাদা।"[১৮]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয়-পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্টাজ লিখেছিলেন। বিহারের এক অখ্যাত কমিউনিস্ট নক্ষত্র মালাকার-এর জীবনী নিয়ে, জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা নিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, বহু বিতর্কিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর রিপোর্টাজগুলো রচনা করেছিলেন। তাঁর সাংবাদিক বন্ধু কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"ঘটনা, পরিস্থিতি ও জনগণের ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে তিনি রিপোর্টাজগুলি লিখেছেন। আর এই কাজে তাঁকে সবসময় ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হয়েছে। তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু দেখার ও পর্যালোচনা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। আর ছিল মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সাংবাদিক হওয়ার এই গুণগুলিই তাঁকে স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ রিপোর্টাজগুলি লিখতে সাহায্য করেছে।"[১৯]

অসীম ধৈর্য ও বিশ্বাস নিয়ে দীপেন্দ্রনাথ সম্পাদনার কাজ করতেন। পত্রিকা-বিষয়ে তিনি শুধু বিষয় ও রচনার উন্নতমাত্রার কথাই ভাবতেন না। পত্রিকার শৈলীর দিকেও তাঁর বিশেষ নজর ছিল। তাই প্রতি বছরই তিনি পত্রিকার প্রচ্ছদ পরিবর্তন করতেন। তাছাড়া বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদও বিশেষভাবে করতেন। তাঁর সম্পাদনায় 'পরিচয়' হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক সমাজ-সময়-জীবনের দলিল। গোপাল হালদার 'আত্মার দীপ্তি' প্রবন্ধে তাই বলেছেন—

> " 'পরিচয়' চালনার ভার যখন দীপেন নেয় তখন তার চেয়ে যোগ্যতর কাউকে আমি দেখি নি। তবু নিজের অভিজ্ঞতার ফলে আমি তাতেও সর্বাংশে আশ্বস্ত বোধ করি নি। আমার অভিজ্ঞতা একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু আশঙ্কা যে কতটা অমূলক তা আমার কাছেও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল 'পরিচয়' পরিচালনায় দীপেনের অসামান্য কর্মকুশলতায়। আমি যাঁদের দিয়ে 'পরিচয়'-এ লেখাবার কথা ভাবতেও সাহস করি নি, তাঁদের দিয়ে সে লেখাল, নিয়ে এল তাঁদের স্বাক্ষর 'পরিচয়'-এর পাতায়— এ শুধু তার অদম্য পরিশ্রম না, আত্মপ্রত্যয় ও সৌজন্য নয়, আন্তরিকতারও প্রমাণ। তার রাজনীতির পরিচয় কারো নিকট অজানা নয়, কারো কাছে সে 'পরিচয়'-এর মর্যাদা ক্ষুন্ন করেনি। তথাপি প্রত্যেককে সে আকৃষ্ট করল নিজের ঐকান্তিকতায়। দীপেনের সঙ্গে, তার নীতির সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁরা 'পরিচয়'-এ লেখা দিয়েছেন, তা দিয়ে না উঠতে পারলে দীপেনের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, যে মত যে পথ দীপেনের মতো মানুষের এই চারিত্রশক্তিকে সচেতন ও সবল করে তাকে তুচ্ছ ভাবতে পারেন নি।
>
> দীপেন যখন এক একটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনার প্রস্তাব নিয়ে আসত আমি তখন তাতে সায় দেবার অপেক্ষা যা করতাম তা হচ্ছে প্রকারান্তরে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা। মনে হত, দুশ্চেষ্টা — আমাদের সে সামর্থ্য নেই। বারেবারেই চমকিত ও চমৎকৃত হয়ে বুঝেছি — তাঁর আত্মপ্রত্যয় শুধু আত্মপ্রত্যয় নয়, তার আত্মার দীপ্তি।"[২০]

জীবনের সমস্ত কর্মেই দীপেন্দ্রনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। এক অর্থে দানবিক পরিশ্রম করতেন তিনি সম্পাদনার কাজে। "আমি তোমার দু-একটা শারীরিক কষ্টের কথা জানতাম। কিন্তু

হাসপাতাল, চেক আপ্ শব্দগুলোকে ইদানিং মোটেই ভালো লাগতো না। হ্যাঁ, একরকম কুসংস্কারই বলতে পারো। তোমার বয়সের সঙ্গে শব্দগুলো আরোই বেমানান।"[২১] এধরনের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও দীপেন্দ্রনাথ অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। তাঁর একসময়ের সম্পাদক-সাংবাদিক বন্ধু কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> " 'কালান্তর'-এর শারদ সংখ্যা প্রকাশের প্রায় একমাস আগে থেকে তিনি এই দপ্তরটিকে তাঁর ঘর-বাড়ি করে নিতেন। সারা দিন-রাত সম্পাদনার কাজ চলত। ভোরের দিকে বেঞ্চির ওপর শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতেন। দুপুরে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, 'খাওয়া হয়েছে?' তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলতেন,— 'সামসিতে ('মুসলিম রেস্তোরাঁ) ব্রাহ্মণ ভোজন সেরে পান খাচ্ছি।"[২২]

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় দীপেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে বাংলাদেশ সহায়ক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমিতি গাড়ে ওঠে। আর এই সমিতির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনিই। এছাড়া গয়ায় ন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এবং পরে কলকাতার প্রগতি লেখক সংঘের পুনরুজ্জীবনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৫৪-তে যে সাহিত্যিক প্রতিনিধিদল পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন তাতে দীপেন্দ্রনাথও ছিলেন। ১৯৭১-এ একবার সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং ১৯৭৪-এ একবার লেবাননে গিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূত্রেই। দীপেন্দ্রনাথের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আমরা জানি তিনি তাঁর উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের প্রায়ই নেতৃত্ব দিতেন। তাছাড়া বিভিন্ন সম্মেলনে তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "... প্রবল গোলমালে সব গুলিয়ে যাওয়ার দশা। দীপেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে মাইকটা টেনে নিয়ে ডাকলেন ফ্রেন্ডস্হু কয়েক মিনিটের বক্তৃতা, সভা আবার শান্ত, সম্মিলিত হল। বিভিন্ন সময়ে দেশের হয়ে সাহিত্যিকদের নানা আন্তর্জাতিক সভাতে যোগ দিয়েছেন তিনি। স্কুল ছাড়ার পরেই যান পূর্ব বাংলায়, তখন পূর্ব পাকিস্তানে, পরে একবার সোভিয়েতে একবার লেবাননে। নানা তর্ক-বিতর্কে বাতাস গরম হতে হতে বেইরুটের সম্মেলন প্রায় ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হয়। দীপেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুমতি নিয়ে মাইকে দাঁড়ান— মিনিট কয়েকের জন্যে। সম্মেলনটা রক্ষা পায়।"[২৩]

ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই দীপেন্দ্রনাথ যুব আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল যুব উৎসবের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ। স্বল্প-পরিসরে দীপেন্দ্রনাথ স্মারকপত্রকেও সাহিত্য মর্যাদায় উন্নীত করতেন। ছাত্র-আন্দোলন থেকে শিল্প-সাহিত্য সবই ছিল দীপেন্দ্রনাথের সংকল্প ও কর্তব্যের মধ্যে। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পোস্টার আঁকছেন, টুল পেতে বক্তৃতা দিচ্ছেন কিংবা রাত জেগে পার্টি মিটিং করছেন অথবা তৃতীয় ভুবন লিখছেন তখন, সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক নেই। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' থেকে 'ঘাম', সম্ভবতঃ 'জটায়ু'-ও লেখা হয়ে গেছে। দীপেন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যান ধারণা এবং বিশ্বাসে — রাজনীতিতে কিংবা শিল্পে — কড়া ধাতের হলেও নিজেকে কখনোই সীমাবদ্ধ হতে দেন নি। আর সেই জন্যেই তাঁর কর্মকুশলতা অন্য মত, অন্য ধারার শিল্পীসাহিত্যিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে। একদিকে যেমন তিনি সহমতের শিল্পীসাহিত্যিকদের সংগঠন গড়ে তুলেছেন, ছুটে গেছেন দিল্লীতে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে। কমিউনিস্ট শিল্পী এবং শিল্পী কমিউনিস্ট হিসাবে দীপেন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল এমন এক সম্মিলনের যেখানে সৎ সাহিত্য আর সৎ শিল্পের পটভূমিতে জড়ো হবেন সবাই; পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে। তাঁর এই স্বপ্নের মধ্যে এমনই একটা প্রাণদেওয়ানেওয়া তীব্রতা ছিল, সততার এমন শক্তি ছিল, আন্তরিকতার এমন টান ছিল যে কেউ-ই তাঁকে অস্বীকার করতে পারতেন না।"[২৪]

দীপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর নেতৃত্বে বহু সাহিত্য সম্মেলনে সেদিন অনেক অকমিউনিস্টরাও যোগ দিয়েছিলেন। দীপেন্দ্রনাথ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর কথায় ও আচরণে কখনো বিনয়ের অভাব ছিল না। বিশ্বের যাবতীয় অবিচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি শিল্পীসাহিত্যিকের হয়ে লড়াই করতেন। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "পঁচাত্তরের এপ্রিলে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন করার ভার নেন দীপেন্দ্রনাথ। জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দীপেন্দ্রনাথ ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতার রাস্তায়। অবিশ্বাস্য সাড়া পাওয়া গেল। যাঁদের স্বাক্ষর পাওয়া অসম্ভব বলে

মনে হয়েছিল তাঁরাও ফেরালেন না দীপেন্দ্রনাথকে। যে দু-একজন ফেরালেন, চলচ্চিত্র জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে, তাঁরাও 'পরিচয়'-এর দপ্তরে এসে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করে গেলেন কেন স্বাক্ষর দিতে পারছেন না; 'ভুল বুঝো না, দীপেন'। বাংলার মঞ্চ জগতের এক প্রধান পুরুষ তিনদিন এলেন পরিচয়-এ, ব্যাখ্যা করতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এসে স্বাক্ষর দিয়ে গেলেন।"[২৫]

দীপেন্দ্রনাথকে জানতে গেলে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথাও জানতে হয় বিশেষভাবে। কারণ বৃহৎ কর্মজীবনেও তাঁকে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করতে হয়েছে তাঁর শারীরিক প্রতিকূলতার সঙ্গে। শারীরিক প্রতিকূলতার মধ্যেই তাঁর সমগ্র জীবনকর্ম। তাঁর শিক্ষা-সৃষ্টি-রাজনীতি প্রতিটি বিষয় আলোচনার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে তাঁর প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামকে। দেবেশ রায়ের কথা থেকে দীপেন্দ্রনাথের সংগ্রামী চরিত্রকে পাওয়া যায় অনায়াসেই—

"ওর রোজকার বেঁচে থাকাটাই ছিল প্রায় অঘটন। কিন্তু সেই দিনগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে ও বছরের পর বছর বেঁচে যাচ্ছিল। সেটা প্রায় এমনই যুক্তির বাইরের ব্যাপার, যে, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, এভাবেও তাহলে চলতে পারে, এভাবেই তাহলে চলবে। দীপেন এরকমভাবেই ঠিক চালিয়ে যাবে। এরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বসলে, চট করে দাঁড়াতে পারে না। দাঁড়ালে চট করে হাঁটতে পারে না। হাঁটতে শুরু করলেও চলতে পারে না — হাঁটি হাঁটি করে কিছুটা গেলে একটা গতি পায়। সেইটুকু হাঁটার জন্য সারাটা শরীর দোলাতে হয়। নিউ আলিপুর থেকে কলেজ স্ট্রিটে 'পরিচয়'-এ আসত ভিড়ের চোদ্দ নম্বর বাসে, প্রায় নিয়মিত। ফিরত ঐ একই নম্বরের শেষ বাসে। নিজের জোরে ফুটবোর্ডে উঠতে পারত না। হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়লে কন্ডাক্টর তুলে নিতেন। ওঠা দেখে মনে হত না, নামতে পারবে। শোয়া-বসা-হাঁটা-চলা, এমনকি কথা বলা, কোনো ভঙ্গিতেই দীপেন স্বস্তি পেত না বহুকাল। গড়িয়ে শুয়ে পড়লে প্রথমে মনে হত, বুঝি একটু আরাম হচ্ছে। কিন্তু একটু পরেই শুরু হত শ্বাসের টান। তখন, এপাশ-ওপাশ চিত-উপুড় হয়ে হয়ে আরাম খোঁজা, পিঠ ও ঘাড়ের নীচে বালিশের ঠেকনা দিয়ে শ্বাসের স্বস্তির চেষ্টা। অনেককালই, দীপেন, শরীরের সব ভঙ্গি হারিয়ে

ফেলেছিল। কিন্তু দীপেন জেনে গিয়েছিল, একবার যদি সে সেটা মেনে নেয়, তাহলে তাকে স্থায়ীভাবে শয্যা নিতে হবে। শারীরিক চরম অসুখে সব মানুষই এটা বুঝে যায়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকত, শুয়েই থাকত। গড়িয়ে গড়িয়ে খেত, নস্যি নিত, চিত হয়ে ভাবত, উপুড় হয়ে প্রুফ দেখত, ভারি অভিধান যখন চোখের এত কাছে চলে আসত যে পড়া যায় না — তখন সেটাকে টেনে পেটের ওপর তুলতে, চিত হয়ে শুয়ে গেলাস গলায় জল ঢালত। ... টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন' থেকে এক ঠাট্টা আমাদের চালু ছিল— বাড়িতে ঢুকলেই দীপেন হরাইজন্টাল, ভার্টিক্যাল হলেই রাস্তায়। সারাদিন শুয়ে থাকলেও, সন্ধ্যায় সে বেরিয়ে পড়ত, তার কাজে। দীপেনও নিশ্চয়ই জানত, শোয়ার আরামটা মেনে নিলে তাকে স্থায়ীভাবেই শয্যা নিতে হবে। শরীর নিয়ে ঐ কষ্টটা যে সে করে যেতে পারছে সেটাই তাকে বেঁচে থাকার শারীরিক বল দিত। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইটা শেষ পর্যন্ত তো এক শারীরিক লড়াই। সহায়হীন, নিঃস্ব। লড়াই। আমরা দেখেছি আর ভেবেছি, তা হলে এভাবেও চলবে, দীপেন ঠিক চালিয়ে যাবে।"[২৬]

বহুমাত্রিক দীপেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অপর একটি দিক শিল্প ও সংগীতের প্রতি আগ্রহ। ক্লাসিক্যাল সংগীতের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। শিল্পসাহিত্যের বিচারে ও চর্চায় তিনি ছিলেন শুদ্ধতার পূজারি। ক্লাসিক আদর্শে স্থির। ভারতীয় রাগসংগীতের প্রতিও তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। তাঁর বিভিন্ন রচনার চরিত্র ও ঘটনায় এই অনুরাগ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ-বিষয়ে দেবেশ রায় লিখেছেন—

"ক্লাসিক্যল ভারতীয় সঙ্গীত ছিল দীপেনের শ্বাস। ক্লাশ এইটে পড়ার সময় ওর মেরুদণ্ডের একটা অসুখ হয়। তিন বছর প্রায় বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকতে হত। নড়াচড়া নেই। বাড়িতে সেতার ছিল। ... মনে হয়, কল্পনা আর দীপেন একইসঙ্গে সেতার শিখেছিল।"[২৭]

দীপেন্দ্রনাথের বহু রচনায় তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তাঁর 'গান', 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গান'-এ দেখি ডিসেম্বরের শীতকে উপেক্ষা করে একদল মানুষ রাত জাগার উৎসব পালন করছে রকসি সিনেমার বাইরে। ভেতরে চলছে উচ্চাঙ্গ সংগীত ও বাজনার আসর। সঙ্গতিহীন সংগীতপ্রেমী মানুষ বাইরে বসে মাইকে শুনছে সেই আসরের

গান-বাজনা। দীপেন্দ্রনাথ লিখছেন—

> "চাল ঠুংরি। সারেঙ্গির পর্দা থেকে পর্দায় সুর ঝরনার মতো নেচে বেড়াচ্ছে। কতগুলো করুণ কান্না যেন পাকিয়ে পাকিয়ে আছড়ে পড়ছে তানপুরার তারে। 'কো-হেলিয়া, তু মৎ করে পুকার'। কোকিল, তুমি ডেকো না। তুমি ডেকো না। তুমি ডেকো না। তুমি ডেকো না কোকিল।"[২৮]

মেরুদণ্ডের অসুখের সময়ও দীপেন্দ্রনাথ সেতার বাজাতেন শুয়ে শুয়ে। যেকোনো কাজের প্রতিই দীপেন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি অসম্ভবকে সম্ভবের চেষ্টা করতেন। দেবেশ রায় লিখেছেন—

> "শোয়া অবস্থায় দীপেনকে অত বড় যন্ত্রটা বুকের ওপর তুলে বাজাতে হত, ঘাটগুলো প্রায় না দেখে-দেখে আর বুকের ওপর শোয়ানো সেতার ওর ছোট হাতের ছোট-ছোট আঙুল দিয়ে সেতারের সব ঘাট ছুঁতে ওকে 'ফুলে-ফুলে' উঠতে হত। দীপেন একদিন বলেছিল, কী করে সেতার শিখেছিল। একবার এক ওস্তাদ ওর বাজনা শুনে বলেছিলেন, এত ভাল মীড়ের কাজ, বীণা শেখো। এ কথা দীপেনের কাছে শুনেছি।"[২৯]

শুধু রাগ-সঙ্গীত নয়, চিত্রশিল্পও তার গল্পে বারবার এসেছে। যা তাঁর চিত্রশিল্পাসক্তির প্রকাশ। দীপেন্দ্রনাথের 'বৃত্ত', 'মডেল', 'মৃত শহর। বসন্ত' প্রভৃতি গল্পে রয়েছে তাঁর চিত্রশিল্পের প্রতি আগ্রহের কথা। আমরা দেখি তাঁর 'বৃত্ত' গল্পে আর্টিস্ট দীপ্ত বন্দ্যোকে রানি বাংলার পটশিল্পের জীবনায়ন শিখিয়েছে। 'মডেল' গল্পে পাই আর্টিস্ট সুরথ ও অরিন্দমকে। আর পাই চিত্রশিল্পের নানা কনসেপশন। তাঁর 'মৃত শহর। বসন্ত' গল্পে হরিপদ এবং চরণবাবু দুজনই আর্টিস্ট। গল্পকারের বর্ণনা এখানে একটা নিটোল চিত্র হয়ে উঠেছে—

> "... সদর দরজার ঠিক বাঁ দিকের দেয়ালের গায়ে একটা জানালা আছে। জানালায় তিনটি গরাদ। ভেতরে ইলেকট্রিকের আলো। সে আলো চমকে আটকে গেছে বন্ধ দরজার ফাটা গায়ে। গগন ঠাকুরের সেই আশ্চর্য সিঁড়িতে যেমন অলৌকিক আলো এসে পড়ে, ছায়া এসে মিলিয়ে যায়, তেমনি কাঠের রঙ-চটা ফাটা ফাটা গায়ে তেরছা ভাবে খানিকটা আলো এবং তিনটে

গরাদের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার সামনে বিলুর ছায়া। সেই ছায়ার সামনে বিলু নিজে। এবং দরজায় যে সামান্য ফাঁক ছিল, তার অবসর দিয়ে বাইরের আলো সরু অথচ ঘন একটা রেখা হয়ে ইস্পাতের ফলার মতো সমস্ত প্যাসেজটা চিরে উঠোনের নর্দমায় পড়েছে।"[৩০]

আলোচ্য বহুমাত্রিক জীবনের অবসান হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি। কলকাতার শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর-২ মাস-৪দিন।

সূত্রনির্দেশ

১. রীতা মোদক, 'কথাপ্রগতি দীপেন্দ্রনাথ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মহালয়া ২০০৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ১১

২. তদেব, পৃ. ১১-১২

৩. দেবেশ রায় (সম্পা.), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ১৭৯

৪. আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৩৮৩

৫. চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দু-একটি কথা', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৫৪

৬. তদেব, পৃ. ৫৫

৭. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 'দীপেন্দ্রনাথের লেখা না-লেখা', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ১০১

৮. রীতা মোদক, 'কথাপ্রগতি দীপেন্দ্রনাথ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মহালয়া ২০০৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৩

৯. দেবেশ রায়, 'দীপেন-দেবেশের দীপেন', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৮৩

১০. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 'দীপেন্দ্রনাথের লেখা না-লেখা', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৯৪

১১. চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দু-একটি কথা', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৫৪

১২. দেবেশ রায় (সম্পা.), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ১৮২

১৩. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 'দীপেন্দ্রনাথের লেখা না-লেখা', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ১০৭

১৪. রীতা মোদক, 'কথাপ্রগতি দীপেন্দ্রনাথ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মহালয়া ২০০৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৬৭

১৫. দেবেশ রায় (সম্পা.), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ১৮৪

১৬. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 'দীপেন্দ্রনাথ: আন্দোলন ও সংগঠনে', উল্লিখিত দেবেশ রায় (সম্পা.), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ২৩৭-২৩৮

১৭. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'সাংবাদিক দীপেন্দ্রনাথ', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.) 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ২৪৪

১৮. তদেব

১৯. তদেব, পৃ. ২৪৫

২০. গোপাল হালদার, 'আত্মার দীপ্তি', উল্লিখিত দেবেশ রায় (সম্পা.), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ২৫৮-৫৯

২১. সমরেশ বসু, 'মুখোমুখি' উল্লিখিত দেবেশ রায় (সম্পা.) 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ২৬৫

২২. কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'সাংবাদিক দীপেন্দ্রনাথ', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.) 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ২৪৫

২৩. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 'দীপেন্দ্রনাথ: আন্দোলন ও সংগঠনে', উল্লিখিত দেবেশ রায় (সম্পা.), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ, ৭+৮ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ২৩৬

২৪. তদেব, পৃ. ২৩৮-২৩৯

২৫. তদেব, পৃ. ২৪০

২৬. দেবেশ রায় (সম্পা.), 'দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ ১', ভূমিকাংশ, 'পরিচয়' ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ. ক-খ

২৭. দেবেশ রায়, 'দীপেন-দেবেশের দীপেন', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৯০-৯১

২৮. অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা.), 'গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়', একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১১৯

২৯. দেবেশ রায়, 'দীপেন-দেবেশের দীপেন', উল্লিখিত আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), 'দিবারাত্রির কাব্য', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পঞ্চম বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর-৯৭, কলকাতা-১২, পৃ. ৯১

৩০. অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা.), 'গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়', একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলা সাহিত্যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি নানা দিক থেকে বিস্ময়কর। একেবারে কম বয়সে যে পরিণত সাহিত্যবোধ নিয়ে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, তার তুলনা খুব বেশি পাওয়া যায় না। প্রবল সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও জীবনের ৪৫ বছরে দীপেন রচনা করেছিলেন প্রায় ৫০ টি গল্প। প্রথম জীবনের লেখার অজস্রতা ক্রমে কমতে কমতে শূন্যে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৪-র পর তাঁর সৃজনশীল রচনা প্রায় নেই বললেই চলে। আসলে সাম্যবাদী রাজনীতির বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দীপেন্দ্রনাথকে অসুস্থ করে তুলেছিল মন থেকে। কারণ তিনি ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। পার্টির হোলটাইমার। পার্টির বিভেদ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল এক নৈরাশ্যের জগতে। শেষ জীবনের কিছু স্মরণীয় লেখা সত্ত্বেও বলা যায় উক্ত নৈরাশ্য থেকে তিনি কোনোদিনই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। ফলে তাঁর সাহিত্য জীবনটা হয়ে উঠে এক প্রতীক — একজন কমিউনিস্ট লেখকের সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততা, বিকাশ ও স্তব্ধতার ইতিহাস। তবে বলা যায় 'নরকের প্রহরী', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'জটায়ু' বা 'হওয়া না - হওয়া'র মতো কয়েকটি অমোঘ গল্প লিখে তিনি বাংলা গল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

কমিউনিস্ট লেখক সম্পর্কে বলা হয় যে তাঁরা শুধু আশার কথাই লেখেন। বিশ্বাস ও জয়ের ছবিই আঁকেন। সে-হিসেবে দীপেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা ব্যতিক্রম দেখতে পাই। তিনি কখনো কোনো অবাস্তব ঘটনায় গা ভাসাননি। সমালোচক অরুণ সেন তাই লিখেছেন —

> "বরং, দেখা যায়, যে সহজ ব্যপ্তি নিয়ে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, ক্রমশই স্বদেশের ও স্বকালের সংকটের চাপে তা খানখান হয়ে ভেঙে গেল, উলটে দেশগত বা সমাজগত অনিশ্চয়তা ও অস্বচ্ছতা যেন লেখার মধ্যেও চারিয়ে যায়। তাঁর বহু চরিত্রের মধ্যে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। গোপন অপরাধবোধ বা এমনকি পাপবোধও উঁকি মারে — কখনও তা প্রকাশ্যে কখনও আড়ালে।"[১]

উক্ত সমাজ-ইতিহাসের বিকার লেখকের মনকেও ভেঙে দিয়েছিল। বলতে হয় এই ভাঙা-গড়ার মাধ্যমেই আবার লেখক নিজে এবং তাঁর লেখা সুস্থ মনুষ্যত্বের জয়পরাজয়ের রূপক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আমরা শ্রদ্ধেয় অরুণ সেনের কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি লিখেছেন —

> "দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা শুরু করেছিলেন বেশ অল্প বয়স থেকেই।

সে বয়সে লেখালেখির অভ্যাস শুরু হওয়াটা এমনিতে হয়তো অস্বাভাবিক নয় — কিন্তু লক্ষ করবার বিষয়, তখন থেকেই তাঁর কলমের অসামান্য জোর ও দক্ষতা। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পাকা। ভাষাও পরিণত এবং অভিজ্ঞ। এত দূর যে, মনে হতে পারে, লেখক হিসেবে অভিজ্ঞতার সব কটি বর্ণমালা যেন তখনই তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। পরে অনেক কিছুরই অদলবদল হয়েছে, কিন্তু অভিজ্ঞতার তাগিদটা যেন রয়ে গেছে একরকমই।"[২]

আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া মধ্যবিত্ত জীবনে অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধে ছিন্নভিন্ন গ্রামীণ মানবিক চেতনার বিপন্নতার অভিজ্ঞতা থেকেই দীপেন্দ্রনাথের লেখা শুরু হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিরূপতার মধ্যেই কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, প্রতিষেধক তৈরি হচ্ছে, শুভ মূল্যবোধ জেগে উঠেছে — এই আশাবাদও তাঁর লেখার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আর সেই সূত্রেই আমরা তাঁর গল্পে পাই পৌরাণিক উপমা, জীবনযুদ্ধে ব্রতী মানুষের বাস্তব ছবি। তিনি লিখতে শুরু করেন বিপন্ন মানুষের ধর্মবিশ্বাস, দুঃখদারিদ্র্য নিয়ে বাস্তবঘেঁষা গল্প। আবার কখনো গল্পে থাকে স্যাটায়ারের ছোঁয়া। 'গ্রহণ' গল্পে পুন্যস্নানার্থী বুড়ি সুবাসিনী গ্রহণের মাহেন্দ্রক্ষণটি হারিয়ে ফেলেন 'গ্রহণদান' সংগ্রহের ব্যস্ততায়। অথচ মর্মান্তিক অপেক্ষায় ছিলেন বুড়ি এই মুহূর্তটির জন্য। আবার সমস্ত কিছু পালটে যায় বুড়োকে একছিলিম তামাক খাওয়ানোর পয়সা সংগ্রহের প্রত্যাশায়। অন্যদিকে 'কান্না' গল্পে কলকাতার বস্তিতে নিরুপায় শরণার্থী এক দম্পতির দুই ছেলের কান্নায়, সংলাপে, স্বপ্নে মূর্ত হয়ে উঠে পঞ্চাশের দশকের স্বদেশ।

১৯৫২-১৯৫৪ এর মধ্যে দীপেন্দ্রনাথের প্রথম গল্প সংকলন 'কাছের যারা'র গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম দিকের রচনায় তিনি গ্রাম ও শহর জীবনের যে ব্যাপ্তি দেখিয়েছিলেন — তা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে পরবর্তী রচনাগুলোতে। শহুরে-মধ্যবিত্ত জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ করে রাখলেন নিজের রচনাকে। উক্ত 'কাছের যারা' সংকলনেই আবার পাওয়া যায় দীপেনের শেষতম ও পরিণততম অভিজ্ঞতার রেশ। তাঁর 'সানাই', 'মহাকাব্যের ভূমিকা' ইত্যাদি গল্প সে সাক্ষ্য বহন করে। গল্পসমূহে রয়েছে ছাত্রজীবন, রাজনীতি, পড়াশোনা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কলকাতা শহর ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে উঠা দীপেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায় —

"যাদের শৈশবে রূপকথার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিল না, যাদের, বাল্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছায়া ফেলল, যাদের কৈশোর গেল দাঙ্গা আর দেশ বিভাগে, সেই আমরা বিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্দ্ধের যুবকরা কী এক আশ্চর্য সময়কালেই না পৃথিবীকে ভালোবেসেছি। কী এক আশ্চর্য সময়। আশ্চর্য এই ভালোবাসা।"[৩]

উপরি উক্ত 'আশ্চর্য সময়' পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে একদশকের (১৯৬৬-১৯৭৬) ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ

এবং আলোড়ন সঞ্চারী। পূর্ববর্তী দশকের অসমাপ্ত মতাদর্শগত সংঘাত বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেশের অন্যতম বৃহৎ শাসক বিরোধী দল সি.পি.আই.-কে। ১৯৬৪ সালে। দুই দলের তাত্ত্বিকরা নিজ নিজ দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই বিচ্ছেদের বর্ণনা করেন। আর উক্ত এই বিচ্ছেদই দীপেন্দ্রনাথকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী (পঞ্চাশের দশক) মধ্যবিত্ত সমাজের এই বিচ্ছিন্নতাকে প্রকাশ করার জন্য দীপেন্দ্রনাথ নিজের ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। এবং প্রবেশ করেছেন বস্তু-বিষয়-ব্যক্তি ও পরিবেশের গভীরে। জাতির শুভবুদ্ধি উদ্বোধনের জন্য তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন তাঁর রচিত চরিত্রের মাধ্যমে। সময়ের শিকার হয়েই লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে সমালোচক সত্য গুহের ভাষায় —

> "যে সব উপাদানে এ সময়ের জাতীয় স্বভাব তৈরি হয়েছে, তা-ই এঁদের নিষ্ঠুর সত্যদ্রষ্টা করে তুলেছে। নিজ নিজ ভূমিতে স্থির থেকে এইসব লেখকরাই 'চিত্ত বিপর্যস্ত ছিন্নমস্তা' সময়ের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন এবং সত্যভাষণে এঁদের কলম কখনো কেঁপে যায়নি। এঁরা দেখেছেন আদি অন্তহীন দুঃসময়ের তুঙ্গাবস্থা এবং তা থেকেই এসেছে আক্ষেপ, হতাশা, আধ্যাত্মিকতায় আত্মসমর্পণ, তীক্ষ্ণধার বিদ্রুপ, শোকমিছিল ও সংগ্রামী মিছিলে অভিযাত্রা। বাংলাসাহিত্যের নতুন ভূমিতে এরা প্রকৃত অর্থে 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী' অথচ জাতে এবং ধাতে এরা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। ... এ সময়ের লেখক দেখেছেন, ... মানুষ একটা রাজনৈতিক জুয়াখেলার ঘুঁটিমাত্র। ... এ অবস্থায় সমস্যা হোলো ব্যক্তির আইডেনটিটির সমস্যা — অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা।"[৪]

অবশ্য দীপেন্দ্রনাথের সময়ও সাহিত্যের দুটি ধারা চলছিল পাশাপাশি। বিশ্লেষণের রীতি ভিন্ন হলেও এঁদের মূল্য লক্ষ্য ছিল মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতার প্রকাশ। এ-ক্ষেত্রে সমালোচক সত্য গুহ জানিয়েছেন —

> "দুটি ধারা একদিকে সন্দীপন, শ্যামল, সমরেশ, শীর্ষেন্দু, মতি নন্দী অন্যদিকে দেবেশ, দীপেন্দ্র একযোগে মধ্যবিত্তের গড়া 'বানানো জগৎ' টার আব্রু সমূলে ফাঁসিয়ে দিয়েছে এবং ইঙ্গিত করেছে বৃহত্তর মানুষের আকাঙ্ক্ষিত ভুবনের দিকে। ... দেশকাল পাত্রর সমস্ত তল এবং কোণগুলোই এখন বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট।"[৫]

বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক ছিল 'ভয়ার্ত সময়'। খণ্ডিত স্বাধীনতা, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবনের অনিশ্চয়তা প্রতিমুহূর্তে জীবনকে-স্বপ্নকে ধ্বংস করে চলছিল। দীপেন্দ্রনাথ এসময় লক্ষ

করেছিলেন — পুরনো স্বপ্ন-বিশ্বাস-মূল্যবোধ সহিষ্ণুতা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে প্রিয়-ভালোবাসার কলকাতা, মানুষ, তাদের আচার-আচরণ-কথাবার্তা। পরিচিত মানুষ-পরিবেশ এই বিপন্ন-অস্থির সময়ের আঘাত সম্পর্কে অপরিচিত। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বর সভা' গল্পের অন্যতম চরিত্র সুধাংশুর মুখে তাই আমরা শুনতে পাই —

> "দ্যাখো, আমাদের অর্ধশিক্ষিত মনটাকে সময় কীরকম পুতুলনাচ নাচায়। মাইরি, আমার আদি ও অকৃত্রিম শত্রু দেখি একটাই — এই সময়। চরিত্রবান থাকতে দেয় না, চরিত্রহীন হতে দেয় না, ছুঁতে পারি না অথচ প্রতিমুহূর্তে নানা ছদ্মবেশ দেখি।"[৬]

দীপেন্দ্রনাথের প্রথমদিকের গল্পে আমরা দেখি মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত জীবনের প্রতিই ছিল তাঁর আগ্রহ। সচেতন পাঠক মাত্রেই লক্ষ করবেন পঞ্চাশের শেষদিকে দীপেন্দ্রনাথের গল্প বদলাতে থাকে। মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশে যায় রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা। তাই জনৈক সমালোচক লিখেছেন —

> "..: আর এই যন্ত্রণা থেকে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রদের নিষ্ক্রমণের পথ দেখান রাজনীতির মধ্যে দিয়ে, কেননা তিনি জেনেছিলেন বিচ্ছিন্নতার নয়, সংযোগেই মুক্তি, ব্যক্তির, ভালোবাসার।"[৭]

দীপেন্দ্রনাথের রচনায় আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর-দেশবিভাগোত্তর একদল কেন্দ্রচ্যুত তরুণ যুবককে পাই। এইসব তরুণদের আমরা পাই 'স্বয়ম্ভর সভা', 'অশোকবন' ইত্যাদি গল্পে। যে তরুণেরদল অসহায়তার মধ্যে ব্যগ্রভাবে খুঁজে চলে একটা যথার্থ নির্ভরভূমি। যারা বিরুদ্ধ প্রতিবেশে নিজেদের বিস্মৃত অভিজ্ঞানকে অন্বেষণ করে। জীবনে বারবার আঘাত পেয়ে জীবনকেই ভয় করতে শিখেছে উক্ত তরুণের দল। এঁদের ক্ষোভ, পরাজয়ের বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা সমস্তই অদ্ভুত নৈপুণ্যে ধরা পড়েছে দীপেন্দ্রনাথের গল্পে। তাই সমালোচক তুষার পণ্ডিত লিখেছেন —

> "... আসলে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক আগুনের ফণা, যার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের যাবতীয় মধ্যবিত্ত লোভ আর হ্যাংলাপনা পরাভূত হতে বাধ্য। কমিউনিস্ট জীবনদর্শনে আপাতমস্তক বিশ্বাসী থেকেও যে মুক্ত-চিন্তক দীপেন্দ্রনাথ (কথাটায় কোনো পরস্পর বিরোধ থাকলো কি ?) পার্টি-বহিষ্কৃত সমরেশ বসুর হাত ধরে লিখিয়ে নিয়েছেন অসাধারণ সব গল্প, ... কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের অসুস্থ যন্ত্রণায় উন্মত্তের মতো ছিঁড়ে চলেছেন নিজের মাথার চুল — সেই দীপেন্দ্রনাথের শোকমিছিলে ডান-বাম সব একাকার।"[৮]

১৯৫২-১৯৬২ পর্যন্ত ছিল দীপেন্দ্রনাথের লেখালেখির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। জীবনের শেষ

সতেরো বছরে (১৯৬২-১৯৭৯) তিনি মাত্র লিখেছেন দুটি গল্প ও একটি উপন্যাস। গল্প দুটো হলো 'হওয়া না-হওয়া' (৬৭), ও 'শোকমিছিল' (৭৩)। এবং উপন্যাসটি 'বিবাহবার্ষিকী' (৭৭)। অবশ্য উক্ত তিনটি রচনাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। দীপেন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যরাজিকে আমরা চারটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি সময়ের দিক থেকে —

১। ১৯৫২-১৯৬২ সাল। এ-সময়কাল দীপেন্দ্রনাথের লেখালেখির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনারাজি এই সময়েরই ফসল।

২। ১৯৬২-১৯৬৭ সাল। এ-সময় আমরা দীপেন্দ্রনাথের একটিই বিখ্যাত গল্প পাই — 'হওয়া না হওয়া' (১৯৬৭)।

৩। ১৯৬৭-১৯৭৩ সাল। এসময়ও দীপেন্দ্রনাথের একটি মাত্রই বিখ্যাত গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়— 'শোকমিছিল' (১৯৭৩)।

৪। ১৯৭৩-১৯৭৭ সাল। এসময় 'বিবাহবার্ষিকী' (১৯৭৭) নামের দীপেন্দ্রনাথের একটিই উপন্যাসের খোঁজ পাওয়া যায়। আর এর দুবছর পর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে মৃত্যু হয় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৫২-১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়কাল বঙ্গবাসীকে নানাভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। সে-সময় ছিল উদ্বেলিত ও উদ্বুদ্ধ হওয়ার সময়। সঙ্গে নিদারুণ আশাভঙ্গেরও কাল। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কমিউনিস্ট হয়ে ওঠেছেন। তিনি পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৫৪ সালে। উক্ত সময়কালের একটি নিখুঁত ছবি আমরা পাই প্রবন্ধিক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। তিনি লিখেছেন —

"... তাঁর প্রাণের অধিক পার্টি তখন এগোচ্ছে, বাড়ছে, ক্রমাগত বড় হচ্ছে। লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে তাঁর চারপাশে চলছে গণ-আন্দোলনের জোয়ার। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে, বঙ্গবিহার সংযুক্তি ঠেকাতে, গোয়াকে মুক্ত করতে, কলেজে ছাত্রবেতনবৃদ্ধি রুখতে, কেরলে বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে খাদ্যের দাবিতে এবং সেই সঙ্গেই লুমুম্বা হত্যার প্রতিবাদে, আফ্রিকার নানা দেশ ও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংহতিতে, কিউবার বিপ্লবের সমর্থনে, মিছিলে মিছিলে কলকাতা তখন কাঁপছে। নেহরু কলকাতাকে একটা নতুন নামই দিয়ে দিলেন, 'মিছিলের শহর'।"[৯]

রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সেসময় পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও জোয়ার বইছিল। নতুন নতুন লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম, আধুনিক বাংলা গানের উত্তাল তরঙ্গ, রাগ সংগীতের আসর, নাট্যজগতে শম্ভু মিত্রের পরীক্ষা-নীরিক্ষা সত্যজিৎ রায়ের অভ্যুত্থান — সব মিলিয়ে বঙ্গবাসী

তখন উদ্বেলিত ও উদ্বুদ্ধ। এদিকে দীপেন্দ্রনাথ প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন দায়িত্ব নিয়ে। ছাত্র ফেডারেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন দীপেন্দ্রনাথ ওইসময়। সঙ্গে সম্পাদনা করছেন ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা'ও। আবার প্রতিটি মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, জলসা থেকে ফিরেই নিজের লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন দীপেন্দ্রনাথ। তাঁর 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসটি এভাবেই লেখা হয়েছিল যত্রতত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে, হোস্টেলে এবং খানিকটা বাড়িতে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সময়ের সহকর্মী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

> "জীবনের সবচেয়ে ফলবান সেই সময়ে দীপেন্দ্রনাথ লম্বা এক রণপায় চেপে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছেন। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে দীর্ঘ পথ পার হয়ে যাচ্ছেন, দ্রুত। চলেছেন তাঁর পাশের ক্ষুদ্রমন, খর্বকায়, বিকৃত সমাজটাকে ভাঙতে ভাঙতে তাঁর স্বপ্নের সমাজ আর জীবনের দিকে। এবং একই সঙ্গে পার হয়ে যাচ্ছেন নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে, নিজেকে। সে এক সুখের সময়, সে এক দুঃখের সময়, সে এক আনন্দের সময়, সে এক কষ্টের সময়, যেমন আশার সময় তেমনি হাতাশার সময়, সে এমন এক সময় যখন মহান সৃষ্টিও করে ফেলা যায় নিতান্ত হেলায়, অতি অনায়াসে। তাই করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ।
>
> লম্বা সেই রণপা তাকে যুগিয়েছিল তাঁর পার্টি আর তাঁর চারপাশের আলোড়ন, আন্দোলন। না, পার্টিই তাঁর রণপা, আন্দোলনই তাঁর রণপা। তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রণপা।"[১০]

দীপেন্দ্রনাথের জীবনের উক্ত ফলবান সময়েই তাঁর জীবনে ঘটে যায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চিন্ময়ী বালার সঙ্গে তাঁর বিবাহ। এই চিন্ময়ী বালাই দীপেন্দ্রনাথের লেখায়, আন্দোলনে, ভেতরে, বাইরে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬২ এর পরে প্রায় থেমে গিয়েছিল দীপেন্দ্রনাথের কলম। তখন তাঁর জীবনে শুরু হয়েছিল এক নতুন সংগ্রাম। বিবাহোত্তর সময়ে পারিবারিক জটিলতার সংগ্রাম। তাঁর সহকর্মী লিখেছেন—

> "... বিবাহোত্তর পারিবারিক জটিলতার সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নিয়ে যৌথ জীবনযাপন শুরু করতে না করতেই ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল খরার কাল। একটার পর একটা সংকট এসে আছড়ে পড়েছিল তাঁদের বুকের ওপর, যেন সমুদ্রের ঢেউ, শেষ নেই। সেই ঢেউ পার হয়ে হয়ে বাঁচতে হয়েছিল

তাঁদের, নিছক টিঁকেও থাকতে হয়েছিল কখনও কখনও। বাঁচার সেই কঠিন দিনে, সেই নারী — শান্ত, প্রায়-নীরব, স্নিগ্ধস্বভাব, অবিশ্বাস্য সহনশীল, নম্র এবং ইস্পাতদৃঢ় সেই নারী শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন আগাগোড়া, অবিচল। তিনি ছাড়া তাদের সন্তানরা, মৃত্তিকা বা মেঘেন্দ্র বাঁচত না, দীপেনদাকেও চলে যেতে হতো আরো আগে, আরো অনেক কম লিখেই।"[১১]

এভাবে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের নানান উত্থান-পতনকে মেনে নিয়েই সাহিত্য চর্চায় ব্রতী ছিলেন। কংগ্রেসের মতাদর্শে বিশ্বাসী এক যৌথ পরিবারের সন্তান দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন আদ্যন্ত একজন কমিউনিস্ট। তাঁর পরিবারের অনেকেই ওই সময়ে রাজনীতিতে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথ সে পথে না গিয়ে তৈরি করেছেন এক স্বতন্ত্র পরিচয়।

সূত্রনির্দেশ

১. *দিবারাত্রির কাব্য,* (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), সম্পা. আফিফ ফুয়াদ, জুলাই-সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ ১৭৩

২. তদেব, পৃঃ ১৭৩-১৭৪

৩. *আমাদের যৌবন ও স্বাধীনতা,* দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দৈনিক স্বাধীনতা', ২৫.১২.১৯৬০

৪. *একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল,* সত্য গুহ 'ধৃতি' ১৫০৩/১০ কল্যাণগড়-উত্তর চব্বিশ পরগণা, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৭-৬৮

৫. তদেব, পৃঃ ৭৮

৬. *গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,* অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), একুশ শতক, কলকাতা, পৃঃ ৩২৬

৭. *বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক,* শ্রাবণী পাল (সম্পা), ভূমিকা অংশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃঃ ২১

৮. *বাংলা প্রগতি সাহিত্য সময় ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত* বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ও অন্যান্য (সম্পা), *দীপেন্দ্রনাথের কথাশিল্প ঃ ভালোবাসার নানা রং,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকতা, পৃ ঃ ৫৩১

৯. *দিবারাত্রির কাব্য,* (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), আফিফ ফুয়াদ (সম্পা), *দীপেন্দ্রনাথের লেখা-না-লেখা,* ১৯৯৭ পৃঃ ১০১

১০. তদেব, পৃঃ ১০২

১১. তদেব, পৃঃ ১০৩-১০৪

তৃতীয় অধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার। স্বল্প জীবনের অধিকারী দীপেন্দ্রনাথ নানান শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে এক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর বহু গল্পই সে সময় ছিল সমালোচিত-বিতর্কিত। আজীবন কমিউনিস্ট দীপেন্দ্রনাথের গল্পে অনায়াসেই স্থান পেয়েছে পৃথিবীর 'মেহনতি' মানুষেরা। গল্প রচনায় তিনি ডুব দিয়েছেন সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে। সহানুভূতিশীল-অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে দীপেন্দ্রনাথ মাত্র চোদ্দো বছর বয়সেই 'দূরের মায়া' গল্পটি রচনা করেছিলেন। প্রকৃতিপ্রেমী এক বালকের মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, গল্পকার আলোচ্য গল্পে। তবে দীপেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আমার দেশের মানুষ'।[১] এই গল্প সম্পর্কে দেবেশ রায় লিখেছেন—

> "সেই ১৯৪৮-এ পনের বছরের দীপেনের প্রথম লেখা 'আমার দেশের মানুষ'-এ শেয়ালদা স্টেশনে উদ্বাস্তু এক শিশু আর 'উদীয়মান শ্রমিক নেত্রী'-র ভিতর প্রায় শ্রেণী সংঘর্ষের কাহিনীটি গল্প বা স্কেচ, বা আমাদের আধুনিক ভাষায়, রিপোর্টাজের কোনো নির্দিষ্ট আকার ছাড়াই সেই কিশোর লেখকের সহজ আবেগ উন্মথনের আধার হয়ে ওঠে।"[২]

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায় দীপেন্দ্রনাথের সম্ভাবনা সম্পর্কে। আসলে শিক্ষা, রাজনীতি-সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফসল গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তাঁর গল্পের সংখ্যা খুবই কম। তবে উল্লেখ্য যে স্বল্পায়ু দীপেন্দ্রনাথ যেকটি কালজয়ী গল্প লিখেছেন— সেগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল সম্পদ।

গল্পকার দীপেন্দ্রনাথের গল্প পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই একজন সংবেদনশীল-অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীর পরিচয় পাই। তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলোতে সমসাময়িক সময়ের ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পগুলো যেন সমসাময়িক সময়ের দলিল। তাছাড়া তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা-মতাদর্শ গল্পগুলোকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে দীপেন্দ্রনাথের প্রতিটি গল্পেরই বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি বিশিষ্ট-কালজয়ী গল্পের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর গল্পে প্রতিফলিত সমকালীন বাস্তব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব।

আমার দেশের মানুষ

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পনেরো বছর বয়সে দীপেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'আমার দেশের মানুষ' প্রকাশিত হয়[৩]। 'কিশোর দৈনিক' পত্রিকায়।

আলোচ্য গল্পে রয়েছে দেশভাগের বলি হওয়া একটি উদ্বাস্তু ছেলের কথা। পশ্চিমবঙ্গের শেয়ালদা স্টেশনে ছিল উদ্বাস্তুদের ভিড়। বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজটুকুও উদ্বাস্তুদের কল্পনার অতীত ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই সেসময় নানান অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। উক্ত গল্পেও রয়েছে সেরকম একটি ছেলের কাহিনি। গল্পে আমরা দেখি মাছ চুরির অপরাধে একটি রোগাপাতলা ছেলে বেধরক মার খায় একজন 'ষণ্ডামার্কা' লোকের হাতে। আর তখনই সেখানে হাজির হন একজন 'জনকল্যাণব্রতী' শ্রমিকনেত্রী। ছেলেটি স্বাভাবিকভাবেই নেত্রীর কাছে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানায়। তখনই—

> "লোকে ক্লেদাক্ত-পিচ্ছিল সরীসৃপের গায়ে পা দিয়ে ফেললে যেভাবে আঁতকে ওঠে সেইভাবে চমকে বেগে সরে গিয়ে নাক সিঁটকে নেত্রী মহোদয়া বললেন— 'আরে দাড়া দাড়া; একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছে। এই গোলমালেই তো ইউনিয়নটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।"[৪]

উক্ত উদ্ধৃতি থেকেই রাজনৈতিক নেত্রীর প্রকৃত স্বরূপ পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। জনকল্যাণের আছিলায় ইউনিয়ন করাটাই মূল উদ্দেশ্য। আসলে গল্পকার ক্ষমতালোভী নেত্রীর চরিত্র এখানে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুলিটির প্রতিবাদী সত্তা তখনই জেগে উঠে। তাই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে লেখকের ধারণা—

> "বৈষম্যের চূড়ান্ত নমুনা দেখে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে আজাদী দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠার পণ গ্রহণ করল কি?"[৫]

আলোচ্য গল্পটি আসলে লেখকের সাংবাদিকধর্মী রচনা। রচনাটিতে লেখকের শৈল্পিক জীবনবোধের পাশাপাশি রয়েছে সমসাময়িক দেশভাগ-দাঙ্গা-উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি। লেখক আলোচ্য রচনায় মানবতাবিরোধী কিছু ভণ্ড মানুষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা গল্পটির মূল সুর হলেও গল্পকার একই সঙ্গে দেখিয়েছেন 'মানবীয় প্রেরণার' জয়। ভবিষ্যতে মানুষের শুভ বুদ্ধির জয়গানের আশায় গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মানুষের স্থূল মানসিকতার পরিবর্তে শুভ 'আত্মার জাগরণ' — এই পর্বের দীপেন্দ্রনাথের গল্পের বিশেষ আবেদন।

দূরের মায়া

১৩৫৮ সালে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) 'দূরের মায়া' গল্পটি প্রকাশিত হয়। দীপেন্দ্রনাথের বয়স তখন ছিল চোদ্দো।[৬]

চোদ্দো বছর বয়সে লেখা দীপেন্দ্রনাথের আলোচ্য গল্পটিতে শব্দের ব্যবহার, অনুভূতির প্রকাশ সত্যিই খুব প্রশংসনীয়। দীপেন্দ্রনাথের জীবনী থেকে জানা যায় তিনি স্কুলজীবনে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে কিছুদিন ছিলেন। সেই আশ্রম জীবনের কথা গল্পটির বহু অংশ জুড়ে রয়েছে। আশ্রমের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য গল্পে। বিহারের দিঘারিয়া পাহাড়ের সৌন্দর্য লেখককে অভিভূত করেছিল। তাছাড়া বিহারের প্রাকৃতিক পরিবেশে লেখকের রোমান্টিক মনের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। ঋতু পরিবর্তনজনিত প্রকৃতিরূপ বিভিন্নভাবে ধরা দিয়েছে লেখকের দৃষ্টিতে। গল্পকার লিখেছেন—

> "আকাশের রঙে বারবার আমি প্রকৃতির উত্তরীয় বদল করার পরিচয় পেলাম। বৈশাখে যাকে কালো পোশাকধারী ঘাতক বলে মনে হল, আষাঢ়ে তাকে দেখলাম সাপুড়ের বেশে— বাঁশি বাজিয়ে সে বর্ষারূপী সাপকে আবাহন করছে। শরতে যে পূর্ণ, হেমন্তে তার রিক্ত সৌন্দর্যের পরিচয় আমাকে অভিভূত করে দিল। শীতে যখন জগতকে দীর্ঘদিনের কবরে প্রোথিত মৃতদেহ বলে মনে হল, তখনই টুনটুনি এসে ঝরাপাতার দেশে বসন্তের আগমনী গেয়ে গেল। ফাল্গুনের নৃত্য হিল্লোল আমার তরুণ বুককে দোদুল দোলায় দুলিয়ে দিল। দোল পূর্ণিমার চাঁদ হোলির নেশায় মেতে মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না ছুঁড়ে পৃথিবীর সাথে ফাগের খেলা সাঙ্গ করল।"[৭]

অনুভূতিপ্রবণ দীপেন্দ্রনাথের মন বারে বারেই ছুটে যায় প্রকৃতির দিকে। একদিকে আশ্রমের নীতি-নিয়ম অন্যদিকে দীপেন্দ্রনাথের মুক্ত প্রকৃতির প্রতি টান — গল্পে সেই আভাস রয়েছে। সন্ধ্যাউপাসনা শেষ করে আশ্রমের ছেলেরা যখন পরাশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত, দীপেন্দ্রনাথ তখন পালিয়ে যেতেন আশ্রমের পেছনের বারান্দায়। তখন ঘন কুয়াশাকে তাঁর মনে হতো সমুদ্র বলে। তিনি ছুটে যেতে চাইতেন দিঘারিয়ার কোলে। তাই তিনি উপলব্ধি করতেন প্রকৃতির ডাক— 'যাত্রা কর, যাত্রা কর। ... উঠছে আদেশ, বন্দরের কাজ হল শেষ'। এ-যেন লেখকের প্রকৃতির কোলে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের আকুতি।

আলোচ্য গল্পে দীপেন্দ্রনাথের মননশীলতার সঙ্গে রয়েছে জ্ঞানের প্রকাশ। উপযুক্ত শব্দ চেন গল্পটিকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গল্পকারের অগাধ জ্ঞান। বাস্তবে দিঘারিয়াতে

যেতে না পারলেও তিনি স্বপ্নে চলে যান সাইবেরিয়া-বাগদাদ-চিন। একই সঙ্গে স্বপ্নে চলে যেতে চান দিঘারিয়ার— '... আর আমার মিতা দিঘারিয়া হাত বাড়িয়েছে আমাকে বুকে টেনে নিতে।'

একটি চোদ্দো বছরের ছেলের প্রকৃতির প্রতি যে গভীর টান তা আলোচ্য গল্পে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির তীব্র আকর্ষণের ফলেই গল্পটির নামকরণ যথার্থ হয়েছে। তবে বলতে হয় অনেক জায়গায়ই গল্পটি সার্থক গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে।

ঝলক

১৩৫৯ সালের ১১ শ্রাবণ রবিবাসরীয় 'সত্যযুগ'-এ 'ঝলক' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৮] ১৯৩৬ সালে বাংলার কৃষকরা ঘোষণা করেছিলেন — 'লাঙল যার জমি তার'। এই সময় কৃষকদের জমিতে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলনেও অংশ নিচ্ছিলেন কৃষকরা। কৃষকদের এই সচেতনতাই কালক্রমে তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নানাভাবে কৃষকদের আন্দোলন ব্যর্থ করলেও একেবারে নিঃশেষ করতে পারেনি। বরং কৃষকদের সচেতনতা-একতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য গল্পটি রচিত। জনৈক সমালোচক 'বালক' গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন—

> "এখানেও চাষিদের দাবি, লাঙল যার জমি তার। এই দাবির উত্তরে লাটদার রাত্রির অন্ধকারে বাঁধ কাটিয়ে চাষিদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে। হাহাকার পড়েছে কৃষক সমাজে। তবে তারা হাহাকারেই থেমে থাকেনি। এগিয়ে এসেছে লাঙল-কোদাল হাতে কৃষক-কৃষিণীর দল। আর তাদের পুরোধা হবে 'সে', যার দৃষ্টিতে রয়েছে দৃঢ়তার অঙ্গীকার?
>
> 'ঝলক' গল্পের বিষয় সমগ্র কৃষক-সমাজ। কিন্তু সবার শক্তি কেন্দ্রস্থ হয়েছে তার মধ্যে যাকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে 'যেন মাটির সশস্ত্র রক্ষক। ... চোখ দুটো অন্তর্মুখী, কিন্তু আগুনের পরশ আছে তাতে। ... কোনো— কোনো শক্তিই তাকে পারবে না এই সৃষ্টি সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে।' "[৯]

ছোটোগল্পের গঠন অনুযায়ী আলোচ্য গল্পে চরিত্রের উত্থান-পতন, কাহিনির জটিলতা না থাকলেও জাতীয় বিপ্লবের স্বরূপটি সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। গল্পের ছোটো পরিসরের মধ্যে সমসাময়িক সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ফুঁটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। কৃষকদের নিজ অধিকারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই গল্পটির সার্থকতা।

আলোচ্য গল্পটির ভাষা-রচনাভঙ্গি মৌলিকতার দাবি রাখে। জাতীয় আন্দোলনের মতো সিরিয়াস

বিষয়ের শুরুও গল্পকার সাবলীল ভাষায় করেছেন। শুরুটা অনেকটা কাব্যিক হলেও পাঠক সহজেই প্রবেশ করতে পারে গল্পের গভীরে—

> "তাকে দেখেছিলাম চৈত্র শেষের সন্ধ্যায়। নীল আকাশের বুকে ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে রাঙা আবিরের রূপে বিদায়ী সূর্যের রক্ত আশীর্বাদ।"[১০]

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা লেখকের সচেতনতার পরিচয় পাই। 'স্বাপ্নিক শপথ' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে গল্পটির বাস্তব প্রেক্ষাপট অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায়।

অ্যাকসিডেন্ট

১৩৫৯ সালে 'অচলপত্র' ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'অ্যাকসিডেন্ট' গল্পটি।[১১] শিয়ালদা স্টেশনে একটি অ্যাকসিডেন্টের বর্ণনা রয়েছে গল্পে। অ্যাকসিডেন্টের পটভূমিতে উপস্থিত হয় একজন রিপোর্টার। মানুষের মনের হিংসাত্মক দিকের পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য গল্পে। অ্যাকসিডেন্টের ফলে রক্তের বর্ণনা ও পরমুহূর্তে মৃত্যুর বর্ণনাতে সহজেই গল্পকারের 'সংশয়াত্মক ধারণা'র পরিচয় পাওয়া যায়। মৃতদেহটিকে দেখতে আসা জনতার ভিড় দেখে লেখকের মনে হয়েছে—

> "এ যেন এক মহাজীবনের বিচিত্র তীর্থশালা। মিলনের গোয়ালও বলতে পারি।"[১২]

শিশু-বৃদ্ধ-ধনী-দরিদ্র মানুষের সমাহারে সেখানে তৈরি হয়েছে এক 'মহাজীবনধারা'। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে— 'সত্যি কি সেই জনস্রোত মহাজীবন?' উপস্থিত মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে লেখকের মনে হয়েছে যেন 'মিলনের গোয়াল'। লেখকের চিন্তায় মানুষ এখানে মানুষেতর প্রাণীর সমান। সমালোচক লিখেছেন—

> "বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র আচরণ প্রকাশিত হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে— রমেশ হালদারের মৃত্যুর ঘটনা। ভিড়ের মাঝে মৃতদেহ চোখে দেখতে না পেয়ে জনৈক ব্যক্তি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে; 'হুঁঃ, লাটসাহেব এসেছেন সব। নিজেরাই শুধু দেখবেন। ...'
>
> এবার ঘটনাস্থলে আগত তিনজন ভদ্রমহিলার দিকে লেখক ফোকাস করেছেন। মাঝবয়েসির হাতে রয়েছে মার্কস ও ফ্রয়েডের বই। বোঝা যায়, যুগ মনস্তত্ত্ব ও মানবমনস্তত্ত্ব নিয়ে তার আগ্রহ আছে। কিন্তু মুখের ভাবান্তর ভিন্ন ইঙ্গিত দেয়। তাতে ঘৃণা, ভয় এবং করুণার মিশ্র প্রকাশ। তাহলে

পুস্তকগুলি কি শুধুই বহন এবং জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রয়োজনে? জীবনধর্মের পাথেয় নয়?

পরবর্তী পর্যায়ে এল স্বেচ্ছাসেবকের দল। তারা দুর্ঘটনাস্থানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তর্কবিতর্ক ও কৌতূহলের ঝড় বয়ে গেল মৃতব্যক্তিকে ঘিরে। তর্কের অবসান ঘটল সরস মন্তব্যে '... সামান্য গাড়ি চাপায় মৃত্যু। এর জন্যে আবার বিচার? ...' জনৈক পথচারী ভদ্রলোকের পরপর দুটি উক্তি, অবস্থানগতভাবে যার বক্তব্য বদলে যায়— মানবচরিত্রধর্মের এই সূক্ষ্ম দিক নির্দেশ করেছে।"[১৩]

তাছাড়া শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীও ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিল। একজন ঘটমানদৃশ্যকে বিকৃত শব্দে প্রকাশ করছে। অন্যজন কানে শুনে মনে মনে ছবি আঁকছে। এখানে আবার লেখক দক্ষতার সঙ্গে হাস্যরস সঞ্চার করে এক বৃদ্ধের নকল দাঁত খুলে যাওয়ার মাধ্যমে। গল্পে নির্মল হাসি সঞ্চার করে গল্পকার দৃশ্যান্তরে চলে যান। শুধু পাঠকের মনে রেখে যান একটি সংকেত— বোবা ও অন্ধ মানুষদ্বয় বিকৃত মানসিকতার অধিকারী মানুষের প্রতীক।

পরবর্তী মাধব ভিখারির চরিত্রের মাধ্যমে লেখকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশ হালদারের অ্যাকসিডেন্টের ঘটনা মাধবকে মনে করিয়ে দেয় নিজের দুর্ঘটনার কথা। দুর্ঘটনায় মাধব তার একটি পা হারিয়েছিল। কিন্তু রমেশ হালদারের পড়ে যাওয়া একপাটি জুতো তুলে নেওয়া ঘটনার মাধ্যমে লেখকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ স্টেশনের পাশে একটি আর্তনাদ রিপোর্টারের সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করেছিল। একটি যুবতী ভিখারিনীর সন্তান প্রসবের ঘটনাকে তার মনে হয়েছে— 'পৃথিবীর বৃহত্তম অ্যাকসিডেন্ট।' কাঁচা-তাজা রক্ত বিচলিত করে রিপোর্টারকে। তিনি অনুভব করেন—

"আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার শুধু নই, সাধারণ মানুষও বটে। এই কান্না, এই আর্তনাদ, এই শোণিত আমার সহ্য হবে না। ছুটে পালালাম সেখান থেকে। মনে হল আমার পেছন পেছন যেন ধাওয়া করে আসছে এক রক্তাক্ত জিজ্ঞাস।"[১৪]

উক্ত ঘটনার পরেই রিপোর্টারের চমক ভাঙে। বারবার তিনি বাস্তব পরিবেশ থেকে পালাতে চাইলেও এবার পরিবর্তন ঘটে তাঁর মানসিকতার। জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

"কেন লেখকের এই পলায়ণপরায়ণতা? দেখা যাচ্ছে এতক্ষণ তিনি রিপোর্টারের মোড়কে বারেবারে নিজেকে আবৃত করে রাখতে চেয়েছেন সচেতনভাবে। কিন্তু এবার মোড়ক খসিয়ে দিল নবজাতকের আবির্ভাভ। তিনি শুধু রিপোর্টার তো নন, তিনি একজন সচেতন সংবেদনশীল মানুষ— ভুলোকের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তাই শিশুটির জন্ম লেখকের কাছে পৃথিবীর 'বৃহত্তম অ্যাকসিডেন্ট' বলে মনে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল লেখক পালাতে গিয়ে আবার ফিরে এসেছন নবজাতকেরই কাছে। এবার তিনি দাঁড়ালেন, দেখলেন,— '... একতাল রক্তের বুকে একটি শিশুমানব আকাশের দিকে মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করছে।"[১৫]

ছোটো ছোটো ঘটনার সমাবেশে লেখক আলোচ্য গল্পের বক্তব্যবিষয়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। দুর্ঘটনাস্থলটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন মঞ্চ হিসেবে। নাটকের মতোই মঞ্চে ঘটে যাচ্ছে নানান ঘটনা। আর মনে হয় গল্পকার দূরে সরে সার্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন। ছোটোগল্পের নিটোল কাহিনি, ঘটনার একমুখীনতা, ঘনবদ্ধতা গল্পটিতে নেই। আসলে রচনাটিকে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের কোলাজও বলা যায়।

ডাক

১৩৫৯ সালে 'অভিক্রমা' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'ডাক' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমসাময়িক সময়ের দাঙ্গার বর্ণনা দীপেন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই রয়েছে। 'ডাক' গল্পটির প্রেক্ষাপটও সমসাময়িক দাঙ্গা। দাঙ্গাবিধ্বস্ত একদল মানুষ ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে ছুটে যাচ্ছে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে— এক নিশ্চিত জীবনের প্রত্যাশায়। গল্পের কথকও তাদের একজন। দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে কিছু নির্মম চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। গল্পটি সম্পর্কে গবেষক রীতা মোদক লিখেছেন—

"মইনুদ্দিনের নিষ্ঠুরতা অস্বাভাবিক নয়। সে নিজেকে টিকিয়ে রাখে বুড়োচাচার জীবনের বা মেয়ে ফতেমার নিষ্ঠুর মূল্যে। বিভিন্ন প্রতিকুলতা পেরিয়ে দলটি পৌঁছে যায় স্বপ্নপুরীতে। তারপরেই কথক ধাক্কা খান। পথমধ্যে চোখে পড়ে গ্রাম্য স্কুলমাস্টার ভবতারণ চাটুয্যের মৃতদেহ। কথকের ধারণা 'মরে গেছেন তিনি, মরে গেছে লোকটা এখানকারই না জানি কোন্ দেশপ্রেমিকের হাতে।' ক্ষণিকের জন্য থমকে যান। এ কোন স্বপ্নলোকে এসে পৌঁছেছেন তিনি?

তখনই কানে আসে সতীর্থদের আহ্বান। সঙ্গীরা সীমান্ত পেরিয়ে সতীর্থকে ডাকার মানসিকতা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এই আহ্বানের অতিরিক্ত আর এক 'ডাক' শুনেছেন কথক। সেই ডাকেই সব বাধা পেরিয়ে তিনি অতিক্রম করবেন এই পথ 'নতুন পৃথিবীর' স্বপ্ন নিয়ে। আর তিনি হাঁটবেন 'নির্ভয়, নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে, ...' "[১৬]

সাধারণত বলা হয় সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যরূপী দর্পণে সমাজের বাস্তব ছবি ফুঁটে উঠে। সাহিত্যের ভূমিকা সেখানেই শেষ নয়। মানুষকে সমস্যা-সংকট থেকেও উত্তরণের পথ দেখায় সাহিত্য। আলোচ্য গল্পে গল্পকার দাঙ্গা বিভেদের ঊর্ধ্বে 'ডাক' শুনেছেন শান্তি-সম্প্রীতির। আর এখানেই গল্পটির সার্থকতা।

শঙ্খ

১৩৫৯ সালে 'সৃজনী প্রকাশের পুস্তিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল শঙ্খ গল্পটি। একটি বংশকে কেন্দ্র করে তার পূর্বতন চোদ্দো পুরুষের বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে। তাছাড়াও গল্পটিতে রয়েছে ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন বিদেশী শক্তির আক্রমণ ও সমাজ পরিবর্তনের ছবি। মোগল আমল থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ এই গল্পের সময়সীমা। দেশভাগের অভাবনীয় বর্ণনা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কলোনিতে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের সঙ্গে কলোনি থেকে তাদের বিতারণের ছবি রয়েছে আলোচ্য গল্পে। প্রবল প্রতিরোধের সামনে নতুনের আবির্ভাবকে স্বাগত জানানো হয় শঙ্খ ধ্বনির মাধ্যমে। আর এখানেই গল্পটির নামকরণ সার্থক। সমালোচক গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন—

"চন্দ্র-মাণিক্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর এই বংশের রাজারা ছিলেন মোগল দরবারের সম্মানিত বন্ধু। কিন্তু আদিত্যশংকর জিজিয়ার প্রতিবাদ করেন এবং রাজকর প্রদান বন্ধ করে বিদ্রোহ জানিয়েছিলেন শাসকের বিরুদ্ধে। এই বংশের বধূ হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েছিলেন, স্বামীর সঙ্গে সহমৃত হননি। সন্তানকে মানুষ করার জন্যই তিনি সমাজ ও শাস্তিকে উপেক্ষা করেছিলেন। রাজকাহিনির আধারে এ গল্প আসলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধেরই গল্প।"[১৭]

ভারতে তখন ইংরেজ শাসন। উক্ত রাজবংশের ত্রয়োদশ পুরুষের মুখে ধ্বনিত হয় আশার নতুন বার্তা—

"শশিশেখর বলেন মানুষ সমাজের জীব। দেশমাতার সন্তান। নিরালা ঘরে জ্ঞানে ধর্মে নিজের মুক্তির সাধনা— সে তো চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। সমাজ যখন ভেঙে পড়েছে, শৃঙ্খলের বেদনায় মায়ের চোখে জল— তখন কেমন করে নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকা যায়?"[১৮]

মার্তৃভূমির আহ্বানে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত তারা। চতুর্দশপুরুষ অর্জুনের রাজ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয় মানবতার জয়। সাম্যবাদ তখন মানুষের মুক্তির হাতিয়ার। অর্জুন অন্যায়ের প্রতি কখনো নির্বিকারভাবে মাথা নত করেনি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তার বক্তব্য—

"শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলে চলবে না। অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়তে হবে। ইংরেজ আমাদের আসল শত্রু নয়, সামন্ততন্ত্র আর ধনবাদই সবচেয়ে বড় বৈরী।"[১৯]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের প্রভাব এসে পড়েছে আমাদের দেশেও। অর্জুনের মাধ্যমে গল্পকার সে কথাই ব্যক্ত করেছেন। গল্পটির নামকরণ প্রসঙ্গে রীতা মোদক জানিয়েছেন—

"নামকরণ প্রসঙ্গ এ গল্পে একটু আলাদাভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে। পঞ্চমুখী শঙ্খটি চন্দ্রমাণিক্যের তথা শ্রীপুরের রাজপরিবারের সম্পদ। বিপ্লব-বিদ্রোহ-বিপদ-আনন্দের বিভিন্ন মুহূর্তে রাজবংশের মানুষের হাতেই সেটি বেজেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ গল্পের পট পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে। তাই রাজতন্ত্রও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়িয়েছে।"[২০]

ভাষার সাবলীল গতিময়তা গল্পের আবেদনকে আরো বেশি প্রসাদগুণ সম্পন্ন করেছে।

গ্রহণ

১৩৫৯ সালে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'গ্রহণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী একটি উদ্বাস্তু পরিবারের দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশার পাশাপাশি পরিবারটির মানবিক-মানসিক অবক্ষয়ের বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য গল্পে।

লক্ষীপাশার সুবোঠাকরান ও লক্ষণ মণ্ডল স্বাধীনতার পর কলকাতার এক কলোনিতে আশ্রয়

নিয়েছে। গ্রহণের পুণ্যলগ্নে স্নানের একান্ত ইচ্ছা ছিল সুবাসিনীর ছোটো থেকেই। কিন্তু দান গ্রহণ করতে গিয়ে তার গ্রহণলগ্ন পেরিয়ে যায়। সে আর স্নান করতে পারে না। আলোচ্য গল্পে দেশভাগ-মন্বন্তরের ফলে দুরবস্থার সঙ্গে গ্রহণ-স্নানটিকে মিলিয়ে দেখিয়েছেন গল্পকার। ফলে গল্পটিতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল— সেই ধর্মের একটি যোগ রয়েছে গ্রহণের ক্ষেত্রে। যে ধর্ম মানবধর্মের কাছে একেবারেই তুচ্ছ। গল্পে রয়েছে—

> "হ্যাঁ, সুখে থাকবে। আঁচলের দিকে তাকাল সুবাসিনী। চোখ ছলছল করে এল। শুকনো বুকটায় দোলা জাগল। আহা বেচারীরা, আহা বুড়োর এক ছিলিম তামাক। গ্রহণ দান, গ্রহণ দান বাবু ...।"[২১]

যুদ্ধ-দাঙ্গা-মন্বন্তর মানুষকে বাধ্য করেছে লক্ষীপাশা থেকে কলকাতায় আশ্রয় নিতে। এক্ষেত্রে বলতে হয় গল্পের নামকরণে রয়েছে যথেষ্ট ইঙ্গিতময়তা। জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

> "গল্পের নামকরণে ইঙ্গিতময়তা রয়েছে— 'গ্রহণ'। আপাতভাবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রহণ লেগেছে মানুষের জীবনে, যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশভাগ মানুষকে অসহায়-অমানবিক করে তুলেছে। গ্রহণ লেগে ছেড়ে যায়। কিন্তু যে রাহুগ্রাস লক্ষ্মীপাশার বারুই পরিবারকে করালমূর্তিতে ঘিরেছে তার কোনো শেষ নেই। সে গ্রহণ মানুষের সব সপ্ন ভেঙ্গে তার বেঁচে থাকার অর্থকে পাল্টে দিয়েছে। স্তব্ধ করেছে। নিতাই-এর অনেককিছু বলার থাকলেও সে বলে না কিছুই। আবার সুবাসিনী কারণে-অকারণে বলে। তাদের জীবনের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের শেষ নেই। এ জন্যই সুবাসিনীর গ্রহণস্নানে হয় না গ্রহণমুক্তি। এখানেই রচনাটির 'গ্রহণ' নামকরণ সার্থক ও ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে।"[২২]

আলোচ্য গল্পের রচনারীতি দীপেন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পের থেকে আলাদা। প্রাকৃতিক গ্রহণের সঙ্গে দেশভাগের দুর্দশা ও বর্তমান অবস্থার আশ্চর্য মিল দেখিয়েছেন গল্পকার। গল্পে দেখা যায় 'ছব্বিশ' তারিখ ভুক্তভোগীদের কলোনি ছাড়তে হবে। গল্পে রয়েছে—

> "এখানে নাকি জমিদারের নিজের প্রয়োজন আছে। অতত্রব ছাড়তে হবে এটুকুও। শেষ সময় ছাব্বিশ তারিখ। এবং তার আগের দিন ...।"[২৩]

মানবজীবনের চরম অর্থহীনতা এবং মানবাত্মার করুণ অপমানের গাথা যেন আমাদের আলোচ্য 'গ্রহণ' গল্পটি।

বৃত্ত

১৩৫৯ সালে 'ঝরনা' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'বৃত্ত' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। রানী নামের একটি মেয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। পূর্ববাংলার চন্দনার রানী কলকাতায় 'নেচার কিওর হোম'-র নার্স হয়ে ওঠার কাহিনি রয়েছে আলোচ্য গল্পে। দেশভাগ-মন্বন্তরের ফলে মানুষের যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল— আলোচ্য গল্পটি তারই বিশ্বাস্য একটি দলিল। সমালোচক জানিয়েছেন—

> "চন্দনার রানী জ্ঞান-বোধ-ব্যক্তিত্ব-সেবাপরায়ণতায় ভরপুর নির্মল মূর্তি। দীপ্ত বন্দ্যোর মত প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টকে বাংলার পটশিল্পের মূল ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। নারী মনোরঞ্জনকারী দীপ্ত রানীর সেবায় মুগ্ধ হয়েও অনুভব করেছে 'এ সবই তো তার নির্বিশেষ, দীপ্ত বন্দ্যোর স্পেশিয়াল কিছু নয়।' রানীর জীবনের আদর্শ তার কথাতেই স্পষ্ট— 'মামুষ মাত্রেই একের জন্য অপরের দায় নয় দায়িত্ব আছে দীপ্তদা।' "[২৪]

গল্পের দ্বিতীয় পর্বে রানী কলকাতার 'নেচার কিওর হোম'-র নার্স হিসেবে নিযুক্তি পায়। সেই সঙ্গেই রানী 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকার ন্যুড মডেল। এই পর্বে বহুদিন পর আর্টিস্ট দীপ্তর সঙ্গে রানীর দেখা হয়। চন্দনা রানীর বর্তমান অবস্থা একটা বাক্যেই স্পষ্ট— 'যেন এক সীমাহীন অপব্যয় আর বিষন্নতার প্রতিমূর্তি।' গল্পে রানী 'সিফিলিস-গনোরিয়া' রোগের শিকার। সমালোচক লিখেছেন—

> "রানীর আদর্শ নারীত্বের রূপ, সনাতন ভারতীয় মহিমায় যে মেয়েটি উদ্ভাসিত— তার জীবনবৃত্ত কি সম্পূর্ণ হলো তথাকথিত বাস্তবতা বা 'রিয়্যালিটি'র এমনতর অভিক্ষেপে? রানীর রূপ, গুণ, সেবাপরায়ণতা, মঙ্গলবোধ শরৎচন্দ্রের নারীদের কথা মনে করায়। তার থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে তার যে নির্বাসন— এর যেটুকু সূত্র লেখক দিয়েছেন, তা ছোটগল্পের পরিসরের কথা মনে রেখেও বলা যায়— যথেষ্ট নয়। এমনকী

প্রথমপর্বে চন্দনা-বৃত্তান্ত সত্যিই বৃত্তান্ত বা 'এ্যানেকডোট'-এর পর্যায়ে চলে গেছে। পরের পর্বে আবার সংকেতধর্মিতার পরিবর্তে তথ্য সমাবেশ— যাতে শিল্পমূল্য যথোচিত রক্ষিত হয়নি। দীপ্তর স্ত্রী সিলভানার গনোরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়ার তাৎপর্য গল্পে প্রতিফলিত হয়নি। দীপ্তর মানবিকতা হয়তো প্রকাশিত তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে। কিন্তু গল্পের বক্তব্যের সঙ্গে বিষয়টির ভাবসঙ্গতি নেই।"[২৫]

আলোচ্য গল্পটি আসলে মানবধর্মের অবক্ষয়ের দলিল। গল্পে দীপ্ত চরিত্রের মাধ্যমে আমরা জীবনমুখী দীপেন্দ্রনাথের জীবনমুখী চিন্তার আভাস পাই। হতাশার পরিবর্তে জীবনের প্রতি সদর্থক চিন্তার মাধ্যমেই গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে।

সানাই

দীপেন্দ্রনাথ রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ডে 'সানাই' গল্পটির শেষে তারিখ রয়েছে ২২ শ্রাবণ, ১৩৫৯। আবার অমত্র পাওয়া যায় ১৩৬০ সালে 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় 'সানাই' গল্পটি প্রকাশিত হয়।[২৬]

সুরঞ্জন আলোচ্য গল্পের মূল চরিত্র। তিন বছর জেল খেটে সুরঞ্জন বাড়িতে আসে। বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে তাই চাপা উত্তেজনা। বৃহত্তর সমাজের চিন্তায় সুরঞ্জন প্রায় ভুলে গিয়েছিল পরিবারের কথা। কিন্তু জেল থেকে ফেরার পর বাড়ির পরিবেশ দেখে সুরঞ্জন সত্যিই আপ্লুত হয়। এদিকে মা-বাবা সুরঞ্জনকে গৃহবন্দী করতে চায়। সুরঞ্জন প্রথমে সেই সিদ্ধান্ত মনে মনে মেনে হয়। সংসারের অভাব দূর করার জন্য সুরঞ্জন ব্যবসা শুরু করলেও সফল হয় না। আন্দোলনের নেশা তাকে ঘরে থাকতে দেয় না। রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতারজন্যই সে নিশ্চিত জীবন ছেড়ে পাড়ি দেয় জীবনের অনিশ্চয়তার প্রতি। সমালোচক গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন—

"অন্যদিকে গল্পটির মধ্যদিয়ে পঞ্চাশের দশকের এক ছাপোষা কেরানি পরিবারের চিত্র ফুটে উঠেছে। সন্তান বড়ো করে তার উপর সংসারের ভার অর্পণ করে এবং তাকে সংসারী দেখে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান প্রৌঢ়-গৃহস্থ অভিভাবক। আন্দোলন তাঁদের কাছে যৌবনের উন্মত্ততা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ স্বদেশভূমিতে সচেতন যুবক সুরঞ্জনের কাছে বিষয়টা তার অস্তিত্বের সমার্থক।"[২৭]

ঘর থেকে সুরঞ্জনের বিয়ের পাত্রী ঠিক হলেও সে বিয়তে রাজি নয়। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সে অনায়াসে ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। তাই সে মনীষাকে জানায়—

> "... আমাকে চাওয়ার পরিণাম জানো? আজ ঘর-বার একাকার হয়ে গেছে। এই সংসারে শুধু সহধর্মিনী নয়, জীবন সংগ্রামে আমার সহকর্মিনী হতে পারবে মনীষা?"[২৮]

বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে বোনের বিয়েতে সে অংশগ্রহণ করে। এবং সানাই বাজানো বন্ধ না করার নির্দেশ দেয়। নিজে প্রত্যক্ষভাবে বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও পরিবারে সুখ-আনন্দ যাতে তার জন্য ম্লান না হয়— সেদিকে তার তীব্র নজর। সুরঞ্জনের অবর্তমানে মনীষা তার দায়িত্ব পালন করে। জগতের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেখার দীপেন্দ্রনাথের প্রবণতার আভাস পাওয়া যায় সুরঞ্জন চরিত্রের মধ্যে। পরবর্তীকালে লেখকের 'তৃতীয় ভুবন', 'বিবাহবার্ষিকী', 'শোকমিছিল' ইত্যাদি রচনায়ও উক্ত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু

'কিন্তু' গল্পটির রচনাকাল ১৩৬৯ সাল। পাঁচটি ছেলের উদ্দাম কর্মক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে গল্পটিতে। হঠাৎ একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে পাঁচ বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্যের তৈরি এবং পুনরায় বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে নানা স্থানের পাঁচটি ছেলে একটি সংস্থায় কর্মরত আলোচ্য গল্পে। পাঁচটি ছেলে সাউড্রি, মঁসিয়ে, কপিশেখর, সিদ্ধান্ত ও মনন শিক্ষিত ও রুচিপূর্ণ। তাদের আগ্রহ শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি-চিত্রকলা সর্বত্রই। হঠাৎ কর্মক্ষেত্রে আগত অরুন্ধতী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিযোগিতার শুরু হয় গল্পে। শেষে দেখা যায় অফিসের 'বস'-এর সঙ্গে অরুন্ধতীর প্রেম। ফলে পরস্পরে আবার আবদ্ধ হয় বন্ধুত্বের সম্পর্কে। সমালোচক লিখেছেন—

> "দেখা যাচ্ছে প্রেমের গভীরতর অনুভূতি বা আত্মনিবেদনের মধ্যে আত্মপ্রসাদ এদের কারোরই নেই। কে কত মূল্যবান উপহার দিয়ে অরুন্ধতীর প্রেম কিনে নিতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে নিজেদের মধ্যে। অরুন্ধতীকে কেন্দ্র করেই সব চরিত্রগুলি আবর্তিত। কিন্তু সরাসরি তাকে আমরা একবারই পেয়েছি। লেখকের অন্যান্য গল্পের নারীরা প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ। অরুন্ধতী

ব্যতিক্রম। তবে ব্যতিক্রমী অরুন্ধতীকে তুলে ধরাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য নয়, আসলে তাকে কেন্দ্র করে পাঁচ যুবকের বিকেন্দ্রিত হয়ে পুনরায় কেন্দ্রীভূত অবস্থাই তিনি দেখিয়েছেন।"[২৯]

পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে মনন চরিত্রটি ব্যতিক্রমী। পাঁচজন একত্র থাকলেও তার মধ্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। অন্যান্যদের তুলনায় গল্পে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। অরুন্ধতীকে বিয়ে করার জন্য বাকিরা প্রস্তুতি নিলেও মননের চিন্তা সম্পর্কে পাঠক একেবারে অজ্ঞই থেকে যায়। বাকি চারজন অরুন্ধতীর প্রেম না পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মননের মন্তব্য 'ভোকাট্টা'। মননের চিন্তা যেন শোক-আনন্দ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে।

গান

১৩৬১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'গান' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। সাধ্যহীন একদল মানুষ প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে শুনতে যায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, হলের বাইরে থেকে। পুলিশি অত্যাচারে দেখা যায় তাদের অধিকারটুকুও নিশিহ্ন হয়। কিন্তু কোনোভাবেই তাদের আগ্রহে ভাটা পড়ে না। 'গান' গল্পটিতে উক্ত কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে।

কাহিনিকে পরিস্ফুট করার জন্য গল্পকার অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন গল্পে। বিশেষ কোনো চরিত্রকে এ গল্পের নায়ক বলা যায় না। অর্থ-সামর্থ্যহীন দলই এই গল্পে নায়কের ভূমিকা পালন করে। গল্পটিতে আমাদের তথাকথিত ভদ্রসমাজকে কটাক্ষ করেছেন গল্পকার। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মানুষ সংস্কৃতির মানে না জানলেও সমাজ তাদের সম্মান-মান্যতা দেয়। অন্যদিকে সামর্থ্যহীন মানুষের সুরুচির মূল্য দিতে আমাদের সমাজ নারাজ। সমালোচক লিখেছেন—

"অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের গানের কথাগুলি ইঙ্গিতপূর্ণ— 'তু মৎ কর পুকার, কোহেলিয়া'। বাস্তবেও দেখা যায়, কোকিলের সুমিষ্ট স্বর হৃদয়তন্ত্রীতে এক যন্ত্রণার ঝংকার তোলে যেন। আর এখানে এই গান বাইরে বসা শ্রোতাদের যন্ত্রণার আনন্দ দিচ্ছে। যন্ত্রণা এজন্যই যে অর্থের প্রতিকূলতার জন্য শিল্পীর সামনে বসে শুনতে পাচ্ছে না। আর আনন্দ কারণ, সামনে না পেলেও কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশের পর উপলব্ধির আনন্দ। লেখকের এই বিশেষ গানটির সংযোজনা বাইরের বসা শ্রোতাদের হৃদয়যন্ত্রণাকে মুখ্য করে তুলেছে।"[৩০]

আলোচ্য গল্পটির climax-এর বিচার আমরা প্রচলিত ধারায় করতে পারি না। ছোটোগল্পের ঘটনার একমুখীনতা আলোচ্য গল্পে সেভাবে নেই। তবে পুলিশি অত্যাচারে স্থানান্তরিত হলেও বংশীর গলায় মৃদুস্বরে গান শুনতে পাওয়া যায়। এই মিলিয়ে না যাওয়া গানের মাধ্যমে গল্পকার সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলেছেন সংকেতের মাধ্যমে।

গল্পটিতে চিত্রকল্পের ব্যবহার পাঠককে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। গল্পটিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলো গল্পের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সমালোচক লিখেছেন—

> "গল্পটিতে অসাধারণ কয়েকটি চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে যা জীবনানন্দের চিত্রকল্পকে মনে পড়ায়। বংশীর গলার সুর সম্পর্কে লেখক বলেছেন,— 'শিশির ঝরা কচি বাঁশপাতার মতো নরম ভেজা গলায় ...।' এমনিতেই কচি বাঁশপাতা স্বভাবে নরম এবং রং-এ মাধুর্যময়, আর শিশির ভেজা হলে আরও সুন্দর মনোহারী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই নমনীয়তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের দৃঢ়তা। কচি রূপের অম্লান পবিত্রতা এবং নিখাদ একাগ্রতাই বংশীর গলার সুরের সাথে একাত্ম হয়েছে। অপর চিত্রকল্পটিও বংশীর প্রসঙ্গে 'নরম রোদের মত মিষ্টি একটি গলা ...' সকালের নরম রোদ আমাদের পুড়িয়ে দেয় না, আরাম দেয়, শান্তির আশ্রয় দেয় বলতে পারি। বংশীর সুরেলা কণ্ঠস্বর শ্রবণেন্দ্রিয়কে আরাম দিয়েছিল। কিন্তু মৃদু থেকে মৃদুতর হলেও তা মিলিয়ে যায় না কারণ সময় হলেই অর্থাৎ বেলা বাড়লেই রোদের তীব্রতা গুণ প্রকাশ পাবে। বংশীরাও রয়েছে সময়ের অপেক্ষায়, নিজেদের প্রকাশের অপেক্ষায়।"[৩১]

গল্পটির নামকরণ গভীরভাবে পাঠকমনে প্রভাব বিস্তার করে। লেখক লিখেছেন— 'দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তখন আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে একটি গান।' বংশীর গলার গানের কথাই এখানে বলা হয়েছে। মাইক বন্ধ করে দেওয়ার পর বাইরের থেকে হলের গান আর শোনা যায় না। সে গান তখন তথাকথিত কিছু সংস্কৃতিবান মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বংশীর গলার গান বাইরে ছড়িয়ে পড়ে 'বিপুলভাবে'। বংশীর প্রানের গান কখনোই সীমাবদ্ধ হতে পারে না। তা ছড়িয়ে যায় খোলা আকাশের রসিক শ্রোতার হৃদয়ে। আর এখানেই গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

মুহূর্ত

১৩৬৩ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'মুহূর্ত' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। দীপেন্দ্রনাথ তখন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র।[৩২]

আলোচ্য গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে অরুণ সেন লিখেছেন—

> "ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বৈতাদ্বৈতের একটা নকশা আঁকা হয়ে যায় এইসব গল্পে। চোখে স্বপ্ন ও উচ্চাশা, বাস্তবে প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার বোধ, মুখে ছাত্রসুলভ স্মার্ট ও রঙ্গরসে ভরা কথার ফুলঝুরি— এসবের আবহে তৈরী হয় তাঁর প্রোটাগনিষ্ট, রাজনৈতিক চরিত্রের একেকটি মূর্তি।"[৩৩]

পুষ্প ও অমলের কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচ্য গল্পটি এগিয়ে যায়। নানা ঘটনার বর্ণনায় চলে আসে কলেজ-ক্লাস ও পরিবারের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। গ্রামের মেয়ে পুষ্পকে একইসঙ্গে সামলাতে হয় সংসারের নানা ঝামেলা। চায়ের দোকানে 'ছ আনা' দিতে না পারায় প্রকাশ পায় দুজনেরই আর্থিক অস্বচ্ছলতার প্রসঙ্গটি। কিন্তু ওদের একমাত্র ভরসা শুদ্ধ বিশ্বাস ও আত্মা। পুষ্পের বাচনিক গল্পে রয়েছে—

> "সত্য আমি অর্থাৎ আমার আত্মা— আমার মধ্যেকার ক্রিয়েটিভ ফোর্স— যার বিনাশ নেই।"[৩৪]

গল্পের মূল সমস্যা অমল ও পুষ্প পরস্পরকে ভালোবেসেও প্রকাশ করতে পারে না। অনেক পরিকল্পনা করেও অমল কিছুতেই 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনে আসতে পারে না। গল্পের শেষে অমল ও পুষ্প পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়। আর তখনই গল্পের 'মুহূর্ত' নামটি সার্থক—

> "থমকে দাঁড়াল পুষ্প। তারপর অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য সুরে হেসে বলল আজ এইজন্যেই বুঝি তোমার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল না?"[৩৫]

দুজন সহপাঠীর 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনের মাধ্যমে গল্পকার নবযৌবনের জয় ঘোষণা করেছেন গল্পে। বৃহৎ কোনো সমস্যার পরিবর্তে দুই সহপাঠীর অন্তরঙ্গতায় সাবলীল কথোপকথনের মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়েছে। ঘটনা-পরিস্থিতি-সংলাপের সঙ্গে আবেগের সংমিশ্রণ গল্পটিকে অন্য মাত্রা দান

করেছে। প্রেমের কাব্যিক রূপও গল্পটিতে উপাদেয়। লেখক 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে যে যৌবনের জয়গান করেছেন— আসলে 'মুহূর্ত' গল্পটিতেই তার সূচনা।

সম্পর্ক

১৩৬৪ সালে শারদীয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'সম্পর্ক' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে অরুন্ধতী অনেক কষ্টের পর একটি চাকরি পায়। অভাবের সংসারে স্বাভাবিকভাবেই অরুন্ধতীর আদর বেড়ে যায় মায়ের কাছে। মায়ের এই পরিবর্তন ভাবিয়ে তুলে অরুন্ধতীকে। তার মনে প্রশ্ন জাগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে। এই সম্পর্কের ভিত্তি উদ্‌ঘাটনের কাহিনিই গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

সংসারের সামান্য কিছু ঘটনাবলি অরুন্ধতীকে ভাবিয়ে তোলে। মায়ের জোর করে ভাত দেওয়ার ঘটনায় সে বিরক্ত হলেও শেষে তার মনে আনন্দের সূচনা হয়। মায়ের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা 'কৃতজ্ঞতা' অরুন্ধতীর মনে কষ্ট দেয়। গল্পে রয়েছে—

> "... দিদি রক্ত জল করে টাকা আনবে, সেই পয়সায় ধাষ্টামো করে বেড়াবে আর বাতাশ করতে বললে ঠোঁট ওল্টাবে। দিনকাল যা পড়েছে। একটু কৃতজ্ঞতাও যদি থাকত।"[৩৬]

স্বাভাবিক সম্পর্কগুলোতে বিনিময়ের প্রসঙ্গ চলে আসায় অরুন্ধতী মনে কষ্ট পায়। বাবার রোজগারের কথা মনে করেও সেখানে অরুন্ধতী 'কৃতজ্ঞতা'র প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না। বরং অনুভব করে বাবার প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসা। আসলে অরুন্ধতী মায়ের 'কৃতজ্ঞতা'র পরিবর্তে আশা করে আদেশের। সমালোচক লিখেছেন—

> "অরুন্ধতী লক্ষ করে তার প্রথম মাইনের টাকা বিভিন্ন খাতে খরচের কথা বললেও মা'র নিজের কোনো দাবি নেই। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পাওয়া ছবি থেকে এটি আলাদা নয়। স্বামীসন্তানকে সুখে-আনন্দে বাঁচিয়ে রাখাতেই তাদের তৃপ্তি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা স্বনির্ভরতা তাদের গড়ে ওঠে না। প্রতি মুহূর্তেই কাউকে আঁকড়ে বাঁচার প্রয়াস। পরবর্তীকালে লেখা 'পরিপ্রেক্ষিত' গল্পেও এই মা'র পরিচয় আমরা পেয়েছি।"[৩৭]

সমস্ত গল্পটিতে ছোটো ছোটো ঘটনার মাধ্যমে গল্পকার অরুন্ধতীর মানসিকতা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে অরুন্ধতী সংসারে সকলের অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণায়পৌঁছতে চায়। মায়ের সম্পর্কে তার ধারণা—

"তিনি এ বাড়ির কর্ত্রী, তাদের মা। মায়ের অধিকার নিয়ে, দায়িত্ব নিয়ে যদি দাঁড়ান, যদি আদেশ করেন— তাহলে কারোর সাধ্য নেই অমান্য করার।"[৩৮]

অরুন্ধতীর মনে হয় মায়ের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য তাদের সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক দিকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায় সম্পর্কের ভিত্তি নির্ণয় করে পরিবারের আর্থিক দিকটি। সমালোচক লিখেছেন—

"এ গল্প কোনো নির্দিষ্ট সময় বা অবস্থার চিত্রণ নয়। এ সমস্যা চিরকালীন। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল পরিবার তাদের একমাত্র রোজগেরে মানুষটিকে এভাবেই আঁকড়ে ধরে। তাকে বাড়তি সুযোগসুবিধা দিতেও সংকোচ করে না। কারণ তার উপরই সংসারের অন্যান্য সদস্য নির্ভরশীল। আর মা'দের যেহেতু সংসারকে ভেতর থেকে শক্ত করে ধরে রাখতে হয় তাই এই দৃষ্টিকটু কাজটা তাদেরই করতে হয়। এই ব্যবহারে আপাত স্বার্থপরতা থাকলেও তাকে প্রচলিত স্বার্থপরতার মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। কেননা তাদের এই ব্যবহার সংসারের অখণ্ড কাঠামোটিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই। তাই অরুন্ধতীর মা স্বামীর আনন্দের কথা ভাবেন, নিজের কোনো একান্ত আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সন্তানেরই আছে। পাখী চরিত্র গল্পের কোথাও প্রত্যক্ষভাবে নেই। মা'র বিভিন্ন সংলাপ থেকেই তাকে আমরা চিনে যাই। পরোক্ষ হলেও চরিত্রটি জীবন্ত। দেওয়া-নেওয়ার হিসেবের জটিলতা এখনও তাকে ছুঁতে পারেনি। আর তাই খেলা বাদ দিয়ে দিদির সুবিধা খোঁজার অবসর তার নেই।"[৩৯]

আলোচ্য গল্পটি একই সঙ্গে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক। মধ্যবিত্ত পরিবারের চাওয়া-পাওয়া-কামনা-বাসনা-ক্ষোভ-অভিমান-প্রত্যাশা-নিরাশার স্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে 'সম্পর্ক' গল্পটিতে। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অরুন্ধতীর আত্মবিশ্লেষণ গল্পটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। তবে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে যখন স্বাভাবিকতা হারিয়ে যায়— তখন অরুন্ধতীর সামনে এক কঠিন প্রশ্ন—

"মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কি? আত্মীয়তা, স্নেহ, প্রেম আর বলবান জাতীয় মধুর কতকগুলি শব্দ দিয়ে জীবনের যে বাস্তবতাকে মানুষ সর্বদা ঢেকে বেড়াচ্ছে, তার পেছনেও বুঝি অর্থনীতির এমনই অনুশাসন।"[৪০]

এসব অনুশাসনের ঊর্ধ্বে উঠে অরুন্ধতী সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার আকাঙ্ক্ষায় গল্পের সমাপ্তি। এখানেই পাঠক 'সম্পর্ক' নামটির তাৎপর্য খুঁজে পায়।

ঘাম

বাংলা ১৩৬৫ সালে 'ঘাম' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'পরিচয়' পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায়। আলোচ্য গল্পে দুটি চরিত্র বিষ্টুচরণ ও এলোকেশী। এলোকেশী গণিকাবৃত্তি ছেড়ে সংসার শুরু করে বিষ্টুচরণের সঙ্গে।

বিষ্টুচরণ হোটেলে কাজ পায় ওয়েটার হিসেবে। চাকরির পাওয়ার পর পরিবর্তন হয় বিষ্টুচরণের চিন্তাধারা। 'বিষ্টুচরণের দৈনন্দিন কাজ ও পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনা এবং মন ও অভ্যাসের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও অপ্রাপ্তির বিকারই আলোচ্য গল্পটির বিষয়বস্তু।' গল্পে বিষ্টুচরণের আচার-ব্যবহার-কথাবার্তা অনেক সময় শ্লীলতার সীমা পেরিয়ে গেছে বলে মনে করেন নানান সমালোচকেরা। তবে পরিবেশ, পরিস্থিতির যথাযথ বর্ণনার জন্যই এমন বর্ণনা ও ভাষার ব্যবহার রয়েছে গল্পে।

বিষ্টুচরণের জীবনের দুইটি ধারা পাশাপাশি চলে আলোচ্য গল্পে। দুটি বিপরীত ধারার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য গল্পে। ওয়েটারের চাকরি পাল্টে দিয়েছে বিষ্টুচরণের জীবন। 'বিষ্টে' হয়ে যায় 'বিষ্টুচরণ'। শুধু তাই নয়—

> "এই হ্যাপিভ্যালির চাকরি বিষ্টুচরণের কাছে মোড়ক খোলা পনিরের মত একটা তাজা বউ পাওয়ারই সামিল। খেতে এট্টু বিস্বাদ, এট্টু যেন তেতো, অথচ স্বাদে আকাঁড়া নতুন।"[৪১]

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টে অন্যমনস্ক বিষ্টুচরণের ভাবনা—

> "কাউন্টারের ডাকাবুকো ম্যানেজার, সুরেন ব্যানার্জি রোডের হোটেল, দেশের বাড়ি, টালিগঞ্জের আস্তানা— সব ভুলে যায়। এবং কী যেন হয়। সমস্ত বসুমতীটা মুছে গিয়ে শুধু হ্যাপিভ্যালি থাকে, সে আর এলোকেশী।"[৪২]

'হ্যাপিভ্যালির ভেতরে সবকিছু জড়িয়ে এলোকেশীর একটা অস্পষ্ট মূর্তি মনে পরে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিষ্টুচরণ তার ভালোবাসার সঙ্গে একাত্ম হতে চায়। উল্লিখিত উদ্ধৃতি তার সেই মানসিকতাকেই ইঙ্গিত করে।' অন্যধারায় বিষ্টুচরণের কলকাতা-টালিগঞ্জের নোংরা ঘুপচি। তার সঙ্গে রয়েছে এলোকেশী—

তার সম্ভাব্য সন্তানের মা। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য ইচ্ছা না থাকলেও তাদের পড়ে থাকতে হয় সেই নোংরা ঘুপচির মধ্যে। এলোকেশীর সঙ্গে বিষ্টুচরণকে গ্রামের সংসারও প্রতিপালন করতে হয়। আবার কখনো কখনো এলোকেশীর প্রতিও তার মনে বিরূপ ধারণার জন্ম নেয়। কারণ তার অজানা—

> "এই শরীলটা, ... এলোকেশীর শরীলের ঝাঁঝাল গন্ধ, ঘামের গন্ধ তাকে টানছে। কিন্তু তবু সেই একটা রাগ, একটা রাগ যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠছে। নিজের ঘামঝরা মুখটা এলোকেশীর ভেজা পিঠের উপর ঘষতে ঘষতেও একটা রাগ, একটা রাগ বিষ্টুচরণের মনে কী যেন করছে, কি যেন চাইছে।"[৪৩]

বিষ্টুচরণের উক্ত মানসিক দ্বন্দ্বের কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন গল্পকার। শহুরে-বস্তিজীবন, গ্রামের পিছু টান ও কামনাবাসনাযুক্ত বিষ্টুচরণ আলোচ্য গল্পে একটি বাস্তব চরিত্র। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাকে থাকতে হয় কলকাতার নোংরা ঘুপচিতে। তথাকথিত মেকি ভদ্রতায় বিষ্টুচরণের অপছন্দ। গল্পে বিষ্টুচরণের ছিমছাম-গোছালো চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিপরীতে এলোকেশী অনেকটাই ঢিলেঢালা, অগোছালো। তবে এলোকেশীর সেবা-যত্ন পরিশ্রান্ত বিষ্টুচরণের মনে চরম শান্তি এনে দেয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে দুজনেই তাদের পূর্বজীবনের কথা ভুলে সহজেই একাত্ম হতে পেরেছে। আবার বলতে হয় এলোকেশীর শরীরে পালিত হচ্ছে বিষ্টুচরণের সন্তান। ভবিষ্যৎ সন্তানের আশাতেই তারা জুরে রয়েছে। গল্পের শেষে বিষ্টুচরণ স্বপ্ন দেখে—

> "... সেই রাতে বিষ্টুচরণ দেখল সে দেশে গেছে। একটা শিশু ছেলে ক্ষেতের আল দিয়ে টলে টলে হাঁটছে। একজনা দৌড়ে এসে তাকে হামলে তুলে নিল। তারপর স্ত্রীলোকটা হাঁপাচ্ছে। তার নাকের ডগায় সিঁদুরের মত বিনি বিনি ঘাম জমেছে।
>
> বিষ্টুচরণ বিড়বিড় করে বলল, বুঝলি এলো, এইবার তোকে একটা নাকছাবি কিনে দেব।"[৪৪]

গল্পের শুরুতে দেখা যায় এলোকেশী বেশ্যাবৃত্তির সাহায্যে নিজের জীবন নির্বাহ করে। বিষ্টুচরণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার জীবন প্রবাহিত হয় এক নতুন ধারায়। কোনো শর্ত ছাড়াই তারা প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হন। এবং শুরু করেন এক যুগ্মজীবন। পরস্পরের প্রতি তারা অনুভব করে এক আত্মিক টান। এলোকেশী একটু অগোছালো হলেও তার সেবা-যত্নে বিষ্টুচরণ সন্তুষ্ট। কোনো কাজের

প্রতিই এলোকেশীর কোনো ধরনের ব্যস্ততা নেই। 'বেশি করে বিষ্টুচরণের ভালোবাসা আদায় করার জন্য ঈর্ষার জ্বালা ধরিয়ে দেয় বাবুর বাড়ির মেজো ছেলের গল্প করে।' আসলে জৈবিক চাহিদার পরিবর্তে এক অন্তরের একাত্মতায় তারা মিলিত হয়— নতুন জীবনের আশায়। সমালোচক লিখেছেন—

> "গল্পটিতে প্রত্যক্ষতঃ নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে। আর তার আড়ালে বিষ্টুচরণের ভাবনায় ফোটে গ্রামীণ চিত্র। নাগরিক জীবনের চাকরিতে তাকে মানুষের লোভ ও ফূর্তির আয়োজন করার জন্য ছুটে বেড়াতে হয়। নির্ধারিত আটঘণ্টা অচেনা মানুষের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয়। এজন্য নিজের প্রতিও তার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আছে। মনে তার গ্রামের ছবি— জমিতে চাষ-আবাদ হয়নি, ফসল হবে না, খরচ বাড়ছে। গল্পের শেষে স্বপ্নের মধ্যে সে দেশের বাড়ি ফিরেছে। এই সমাপ্তি শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির দিকে সৃষ্টি ফিরিছে দেয়। ক্ষেতের আল দিয়ে শিশুর টলে টলে আসা আসলে সরল মানসিকতায় গ্রামে ফিরে আসার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এলোকেশীর সাথে বিষ্টুচরণের সম্পর্কটা আর অবৈধ থাকে না।"[৪৫]

'নাকছাবি' এয়োতি স্ত্রীদের পরিচয় বহন করে বলে বিষ্টুচরণ স্বপ্নে এলোকেশীকে কিনে দেয় 'নাকছাবি'। শহরের যান্ত্রিকতার পরিবর্তে গ্রামীণ পরিবেশে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বিষ্টুচরণের বাসকরার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গল্পকার জীবনের ইতিবাচক দিককে সূচিত করেছেন।

'ঘাম' গল্পটির সমকালীন বিতর্ক প্রসঙ্গে অরুণ সেন লিখেছেন—

> "ঘাম নিয়ে আলাদা করে বিতর্ক হওয়ার কোনও মানে নেই। দীপেন্দ্রনাথের সে সময়ের রচনার ধারাবাহিকতাতেই তা এসেছে। আর তার মধ্য দিয়ে লেখকের মনকে খোঁজা তো আরও হাস্যকর। ... যদিও জানি 'প্রগতিশীল' সাহিত্য মহলের সেকালীন পিউরিটানিজমকে ঘা দেবার মত বহু বস্তুই হয়তো সেখানে ছিল। গল্পের দ্বিতীয়াংশে দেখি, রেস্টুরেন্টের নরক থেকে ফিরে বিষ্টুচরণ বস্তির গুমোট ঘরে, নোংরা মশারীর নিচে, এলোকেশীকে নিয়ে শোয়— প্রাক্তন গণিকা এখন তার স্থায়ী শয্যাসঙ্গিনী।"[৪৬]

কোনো গল্পে বর্ণিত ঘটনা আর ভাষার ব্যবহার যদি অশ্লীল হয় তবে তা বিবেচনার একটা দায়িত্ব থাকে সমালোচকের। আলোচ্য গল্পে বিষ্টুচরণ-এলোকেশীর মিলনদৃশ্যকে কখনোই অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। 'কারণ পরিবেশ ও চাহিদা সেখানে যথার্থ প্রাসঙ্গিকতা দান করেছে।' সমরেশ

বসুর 'প্রজাপতি', বিবর'ও অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। আদালতের রায়ে অশ্লীলতার ঊর্ধ্বে প্রকৃত সাহিত্য হিসেবেই মর্যাদা পায় উক্ত রচনা দুটি। আলোচ্য 'ঘাম' গল্পটির ক্ষেত্রে উক্ত কথা প্রাসঙ্গিক।

চর্যাপদের হরিণী

১৩৬৬ সালে 'পরিচয়' শারদীয় সংখ্যায় 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য গল্পটি নিঃসন্দেহে বাংলা ছোটোগল্পের এক নতুন সংযোজন। নিঃসঙ্গতার ফলে মানুষের মনের যে গভীর যন্ত্রণা— আলোচ্য গল্পে দীপেন্দ্রনাথ তা যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। নায়ক সুধাময়ের আত্মকথনের মাধ্যমে লেখক গল্পটি পাঠকের সামনে প্রকাশ করেন। গল্পটির বিষয়-গঠন, শব্দ ব্যবহারের অভিনবত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়। 'পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিচিত্র সংকট এবং নিরুপায় অন্ধতাই গল্পের এলোমেলো অবয়বে নৈর্ব্যক্তিকতার আস্বাদন সৃষ্টি করেছে।'

গল্পের নায়ক একত্রিশ বছরের সুধাময় ইনসোমনিয়ায় আক্রান্ত। সুধাময়ের চৈতন্যের মাধ্যমে গল্পকার অবক্ষয়িত এক সময়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সমালোচক লিখেছেন—

> "যে কাম্যু পড়ে, যার চেতনায় বিচরণ করেন ভ্যানগগ, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, যীশুখ্রিস্ট, বিদ্যাসাগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডস্টয়েভস্কি, গগন ঠাকুর, নেতাজি, অদ্ভুতাচার্য প্রমুখ। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলার যুবসমাজের দুঃসহ সংকটের বিভিন্ন রূপ দীপেন্দ্রনাথের অন্যান্য বেশ কিছু গল্পেও এসেছে, যেমন 'স্বয়ম্বর সভা', 'অশোকবন', 'নরকের প্রহরী', 'প্রহর' প্রভৃতিতে। নির্ঘুমরাত্রিতে সুধাময় নিজেকে চিনতে চেষ্টা করে। রাতের অন্ধকারে কোটি কোটি ঘুমন্ত আত্মার মাঝে সে একা জীবন্ত।"[৪৭]

অস্থির সুধাময়ের তাই নিজেকে কখনো মনে হয় তেত্রিশ আবার কখনো তেইশ বছরের। কখনো আবার সে সন্দিহান নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে। চেতনা প্রবাহের গভীরে তাই চলে যায় সুধাময়ের মনের ক্রিয়াশীলতা—

> "যুবটি (যার আত্মা নেই, সুধা নেই দেখে, ভাবে। অর্থাৎ যুবকটি (যার আত্মা ছিল— নষ্ট হয়েছে, সুধা ছিল— কুলকুচি করে ফেলে দিয়েছে) দেখে, ভাবে। যুবা বড় দ্রষ্টা, বেজায় ভাবুক।"[৪৮]

নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুধাময় অস্থির। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা তাকে আঘাত দেয় প্রতিমুহূর্তে—

> "... সেই বিস্মৃত বয়সের যুবকটি, সেই সুধাময় হঠাৎ ভাবল তার মুণ্ডু নেই, ধড়টা আছে। সে গল্পের ভুতুড়ে নায়কের সঙ্গে এইটুকুই তফাৎ। একজন কবন্ধ, একজন কাটামুণ্ডু। এবং সে নরকের পাহারাদার। আমি পাতালের বন্ধ কফিন। ... পাতালে প্রেতাত্মা আছে। আর আমি পাতালের কফিনে একটি মৃত যুবক। অথচ আমি, হায় রে, একদা স্বর্গের বনস্পতি হতে চেয়েছিলুম।"[৪৯]

নিজের একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা দূর করতে সুধাময় আদালতে যায় বিচার শোনার জন্য। সেখানে সে অনুভব করে মানুষ কত সহজেই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। প্রকাশ্যে ঘটিত অপরাধের জন্য সুধাময় অন্তরে কষ্ট পায়, অনুভব করে যন্ত্রণা। এলোমেলো চিন্তার ফলে দেখা দেয় সুধাময়ের স্নায়ুবিকার। অবশ্য আগের জীবন যাত্রায় প্রমাণিত হয় তার চিন্তাশীলতার কথা। সমালোচক লিখেছেন—

> "সে সমস্ত কাগজ সে পড়ে না যেগুলোতে ইংল্যান্ডেশ্বরীর সন্তান প্রসবের খবর থাকলেও 'মানিকবাবু মরিতে বসিয়াছিলেন' সে সম্বন্ধে একছত্রও থাকে না। রুচিশীল শিক্ষিত মানসিকতা ধরা পড়ে এর থেকে। সুধাময়ের সৃষ্টিশীল মানসিকতা ও জীবনবাদী ধারণা চর্যাপদের হরিণ-হরিণীর নবব্যাখ্যায় প্রমাণিত হয়। তার মতে হরিণ হল 'সিম্বল অফ লাইফ' এবং হরিণী 'লাভ' এবং শূণ্যতাবাদ আসলে শূণ্যতাহীন, পরিপূর্ণতা, নৈরাত্মা দেবী হল মানবী, শবর বা হরিণ সেই 'ইটার্ন্যাল ম্যান'।"[৫০]

নিঃসঙ্গতা ও বন্ধুহীনতার ফলে সুধাময় গল্পে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ভালোবাসার প্রতি। প্রেমহীনতার জন্য নারীকে তার মনে হয় 'মেয়েছেলে' বলে। ক্রমে সুধাময় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে জীবনের প্রতি। সমস্ত কিছুর প্রতি প্রতিফলিত হয় তার নেতিবাচক চিন্তাধারার। কিন্তু গল্পের শেষে আবার মঞ্জুশ্রীর আগমন সুধাময়কে আশাবাদী করে তোলে। জীবন-জগৎ সম্পর্কে সুধাময় অনুভব করে এক গভীর টান। স্বপ্নহীন সুধাময়ের রূপান্তর ঘটে স্বপ্নময় সুধাময়ে।

গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ সবসময়ই গল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আলোচ্য গল্পটি চূড়ান্তভাবে সার্থক। বিষয়-ভাষা-চরিত্র, form সবদিক থেকেই গল্পটি স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। সুধাময়ের মনোগহনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গল্পকার সচেতনভাবে পুরাণ অনুষঙ্গের ব্যবহার করেছেন। পঞ্চাশ-ষাটের সন্ধিক্ষণে

সুধাময়ের উপলব্ধি— 'আমরা জীবনে শব্দের অস্তিত্ব ভুলে থাকি।' সমালোচক গল্পটিতে ব্যবহৃত পুরাণ প্রসঙ্গ সম্পর্কে লিখেছেন—

> "পুরাণ অনুষঙ্গ দীপেন্দ্রনাথের বেশ কিছু বিখ্যাত গল্পে এসেছে। আলোচ্য গল্পের নামকরণেই এ ব্যঞ্জনা আভাসিত। সুধাময় ভাবে 'মঞ্জুশ্রীর চক্ষু দুটি ঈষৎ ছলোছল এবং গতিতে সে ক্ষিপ্র।' চর্যাপদের ৬নং পদটিতে ব্যূহবদ্ধ ভীতসন্ত্রস্ত এক হরিণীর কালো চোখের চাহনি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানেও চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে পথের সন্ধান ও আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলার চিত্র আছে। মঞ্জুশ্রীর ছলোছল দৃষ্টি ও ক্ষিপ্র গতি চর্যাপদের হরিণীর ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছে। শিল্প ও জীবন তৃষ্ণার সঙ্গে এই হরিণ-হরিণীর বিষয়টি সম্পৃক্ত। তাই প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যেও এই হরিণীর ইমেজ। সুধাময়ের ভাবনায় হরিণ-হরিণীকে খুঁজছে জীবনের শুদ্ধতা খুঁজতে। 'খোঁজে, কারণ খোঁজাই তো পাওয়া। চিরকাল পাবে, কারণ চিরকাল খুঁজবে।' গল্পের শেষে 'সুধাময় দেখলো বাংলাদেশেটা হরিণ হয়ে গেছে। কলকাতা সেই হরিণী'। এখানে বাংলাদেশ হল 'সিম্বল অফ লাইফ' আর কলকাতা তার অন্বিষ্ট ইতিবাচকতা 'লাভ'। আশাবাদী দীপেন্দ্রনাথের কাছে সমস্ত প্রতিকূলতা ছাপিয়ে বাংলাদেশ ও কলকাতা জীবন ও ভালোবাসার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। আসলে 'চর্যাপদের হরিণী' দীপেন্দ্রনাথের জীবন অন্বেষার প্রতীক।"[৫১]

তাই শেষে বলতে হয় আলোচ্য গল্পের আঙ্গিকগত দিক দিয়ে লেখক স্বতন্ত্র। সমসাময়িক অন্যান্য গল্পকারদের বিখ্যাত সৃষ্টিরাজির মধ্যেও 'চর্যাপদের হরিণী'-র মূল্য প্রশ্নাতীত। ব্যতিক্রমী গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ উক্ত গল্পের জন্যই বিখ্যাত হয়ে থাকবেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

নরকের প্রহরী

১৩৬৫ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'নরকের প্রহরী' গল্পটি। গল্পটি প্রথমে 'চর্যাপদের হরিণী' গল্প সংকলনে ছাপা হয়েছিল।[৫২] একটি সার্কাস দলের খেলোয়াড়দের জীবনের যন্ত্রণার দিকটি তুলে ধরেছেন গল্পকার আলোচ্য গল্পে।

গল্পে ভুতো, শশী, গোবরা তিনজন একটি সার্কাস দলের খেলোয়াড়। ভয়ংকর নানান খেলায় মেতে উঠে গল্পের চরিত্রগুলো। খেলার মাধ্যমে চরিত্রগুলো দর্শকদের নরক দর্শন করায়। দলের মালিকের বিশ্বাস সব মানুষ মৃত্যুর পর নরকেই যায়। 'এমনকী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল।' দর্শকদের নরক দর্শন করাতে গিয়ে তিন কিশোরকে যে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল— গল্পে তারই বিবরণ রয়েছে। সমালোচক লিখেছেন—

> "ভুতো সাজে কাটামুণ্ড। তার পরিচয়— নরকের পাহারাদার। 'এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে যমরাজও নরক থেকে নড়তে পারে না।' শশী-জালকুমারী, যার শরীরটা জালের অথচ মাথা মানুষের। গোবরা হয় কুম্ভীপাকের পিশাচ যার বিকৃত তিনটে শরীরে একটিমাত্র মুণ্ড। এই তিনজনের কথা থাকলেও সমস্ত গল্প জুড়ে ভুতোর যন্ত্রণাই ব্যক্ত হয়েছে। চেতনাপ্রবাহমূলক রীতিতে লেখক ভুতোর যন্ত্রণা ও তার অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। ছোট অপ্রশস্ত একটি কাঠের বাক্সে হাঁটু গেড়ে বসে দর্শকের সামনে নরকের পাহারাদার সাজার আড়ালে যে শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা তাই প্রকাশিত এতে।"[৫৩]

গল্পে পাঠকের সামনে ভুতো নিজেকে পরিচয় দেয় যমরাজ বলে। নরক পহারা দেওয়াই তার কাজ। তার অনুভূতি— 'বড় ক্লান্ত, বড় নিঃশেষ মনে হল নিজেকে'। কারণ—

> "চোখে-মুখে জীবিত সুস্থ মানুষের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলে চলবে না। সমস্ত জীবনীশক্তিটাকে একজোড়া চোখে গুটিয়ে আনতে হবে। যে দুটো চোখ বড়, ভয়ানক, বীভৎস। বড় আর সজাগ। ভয়ানক আর সজাগ। বীভৎস আর সজাগ।"[৫৪]

এভাবে কঠোর যন্ত্রণার মধ্যেও ভুতো বাঁচিয়ে রাখে ফাঁকিটাকে। কেননা দলের সম্মান ও নিজের রোজগার নিয়ন্ত্রিত করে ভুতোকে।

গল্পে শশীর বয়স তেরো। জালকুমারী সেজে শশী নরক যন্ত্রণার শিকার হয়। উক্ত বয়সে শশীর মেয়ে সাজার পরিবর্তে, পৌরুষের প্রতিই আগ্রহ বেশি। তাছাড়া মেয়ে সাজার জন্য তাকে তাচ্ছিল্যও শুনতে হয়। ফলে তার মনে নারীজাতির প্রতি এক বিদ্বেষের জন্ম হয়। পরমুহূর্তেই আমরা শশীর প্রতিবাদীসত্তার পরিচয় পাই। মালিককে সে জানিয়ে দেয় মেয়ে সাজবে না বলে। কিন্তু তাকে

সাজতে হয়। পেটের দায়ে তাকে শুনতেই হয় মালিকের নির্দেশ।

গল্পে গোবরার বয়স নয়। 'কুম্ভীপাকের পিশাচ' সেজে মানুষের মনোরঞ্জনে অংশগ্রহণ করে। তার কষ্টের পরিচয় থাকলেও গল্পে তার কোনো অনুভূতির বর্ণনা আমরা পাই না। গোবরার সম্পর্কে গল্পে বলা হয়েছে—

> "ও যখনই ফাঁক পায় একটু শুয়ে নেয়। ওর হাড় নরম, মাস নরম, চামড়া নরম। তাই গায়ে বড় ব্যথা।"[৫৫]

আসলে বয়স কমের জন্য আমরা গোবরার কোনো প্রতিবাদ দেখতে পাই না। তবে ভুতোর কথা বলতে গিয়ে গোবরা অনেকাংশে অবহেলিত বলে মনে হয়।

জটায়ু

'জটায়ু' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৭ সালে 'উত্তরণ' পত্রিকায়। দেশভাগ-দাঙ্গা-উদ্বাস্তু সমস্যা-কলোনি জীবন ইত্যাদির সম্মিলিত প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্পটি রচিত।

নিত্যচরণ ও দুর্গার বাস্তব কলোনি জীবনের বর্ণনাই গল্পটিতে সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে। গল্পটিতে পৌরাণিক পারম্পর্য না থাকলেও 'জটায়ু' নামকরণের মাধ্যমে এক পৌরাণিক অভিঘাত তৈরি করেছেন গল্পকার। গল্পে রয়েছে—

> "ট্রেনের শব্দটা ক্ষীণ হতে ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আবার অন্ধকার। কিছু কিছু নানা চেহারার গাছ আকাশ-মাটি ও শূন্যতার সঙ্গে কালিঝুলি মেখে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ছিটিয়ে আছে।"[৫৬]

গল্পে নিত্যচরণের পা কাটা যায় ট্রেনের চাকার নীচে। ফলে স্ত্রী দুর্গাচরণ শহরের এক হোটেলে কাজ নিতে বাধ্য হয়। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হলেও তাদের সংসারে কখনো অবিশ্বাস-অশান্তি ছিল না। তাদের 'ঘরটায় শান্তি ছিল'। কিন্তু বর্তমান তাদের সংসারে অবিশ্বাস, সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এরজন্য দায়ী দাঙ্গা-দেশভাগ-দারিদ্র্য ও নতুন কলোনি জীবন।

দীপেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই দেশভাগের করুণ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে। সামাজিক-রাজনৈতিক বিপর্যয় কীভাবে মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেসময়— তার পরিচয় পাই আমরা আলোচ্য গল্পে। দুর্গা-নিত্যচরণের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে দাঙ্গা-দেশভাগের ফলে। তাই এক অজানা

আশঙ্কা-আতঙ্কে দুর্গা জর্জরিত—

> "... আমার ভয় করে। কেউ তাকালে আমার পালাতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ অপরিচিত কাউকে দেখলে আমার সন্দেহ হয়। চেনা লোক অজানা কারো সঙ্গে কথা বলছে দেখলে হাত-পা কাঁপে। ভিড় সহ্য হয় না— আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।"[৫৭]

দুর্গার উক্ত পলায়ন প্রবৃত্তি আসলে যুগপ্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।

অমাবস্যার শীতের রাতে কালীপূজায় নাচ হবে নিত্যচরণের। আগুনের বেড়াজালের মধ্যে নাচবে নিত্যচরণ—

> "এক-দুই-তিনবারে বেড়াটা গুটোতে গুটোতে ছোট্ট হয়ে আসবে। ... মাটির বুকে আগুন। অন্ধকারের বুকে আগুন ... অন্ধকার কাঁপছে, আগুন কাঁপছে, ধোঁয়া কাঁপছে। ..."[৫৮]

নিত্যচরণের নাচের ধাপে ধাপে দুর্গার মনে পরে যায় নিজের জীবনের অতীতের কথা। দুর্গার আত্মচিন্তায় ধরা পড়ে—

> "নিত্যচরণ নাচছে আগুনের প্রথম বেড়াজালের মধ্যে। আর দুর্গা ডুবে গেছে আত্মমগ্নতায়। দেশের দাঙ্গার ছবি তার স্মৃতিতে স্পষ্ট। তার কথকতা করা বাক্‌শিল্পী বাবার চুলে, দাড়িতে আগুন লেগে গেছে। সারাজীবন যে পুরাণের গান গেয়ে গেল, সেই পুরাণের কোনো বীর এসে দুর্গার বাবাকে বাঁচায়নি। মা ও মেয়েকে একসাথে জ্বলন্ত বাড়ির সামনে ধর্ষণ করেছিল। তারপরই নদীর এপারে নিত্যচরণের সাথে দুর্গার কলোনিজীবন নির্বাহ।"[৫৯]

এরপর নিত্যচরণ আগুনের বেড়াজালে নৃত্য শুরু করে। তার শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতা দুর্গার মানসজীবনকে আচ্ছন্ন করে ক্রমে। নিত্যচরণের অক্ষমতার জন্য দুর্গা হোটেলে কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তখন নিত্যচরণের মনে দুর্গার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে আবার নিত্যচরণ আঘাতও পায় মনে মনে। এসময় দুর্গাও নিত্যচরণের প্রতি অনুভব করে এক মমত্ববোধ। তাই দুর্গার মনে পড়ে যায় নিত্যচরণের দুর্ঘটনার দৃশ্য। আত্মকথনের মাধ্যমে দুর্গা অনুভব করে নিজের

অস্তিত্ব। দুর্গার পরে মনে যায় তার অপমানের কথা, হোটেলের কেবিনের কথা—

> "... বাবা এঘর থেকে ও ঘরে ছুঁটছে, বেরোতে পারল না, আজানের শব্দ, পোড়া ছাই চোখে পড়ল। তারপর ট্রেনের আওয়াজ, লাইনের ওপর চাকা গড়াচ্ছে, নাট-বল্টু ঝনঝন ঝনঝন বাজছে, দুটো হাত দিয়ে সে গাড়িটা থামাতে চেয়েছিল, পোড়া ছাই চোখে পড়ল। হোটেলের কাউন্টারে রেডিও বাজছে, তারপর সেই লোমশ কর্কশ হাতটা গলায় সুড়সুড়ি দিল, আঙুলে আংটি।"[৬০]

উক্ত আত্মদহনের মধ্যে দুর্গার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় দোলাচলতা দেখা দেয়। কারণ তার বেঁচে থাকা যথেষ্ট প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে— দুর্গার হোটেলের অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ রয়েছে।

গল্পে নিত্যচরণের নাচের এক একটি বিশেষ পর্বের অনুষঙ্গে দুর্গার জীবনের এক একটি পর্ব উঠে এসেছে। এক সময় নিত্যচরণের নাচ পাঠকের কাছে যেন প্রতীকী অর্থে ধরা দেয়। নিত্যচরণকে তখন মনে হয় 'পুরাণের একটা পুরুষ' মাটিতে নেমে এসেছে। অগ্নিরথের সারথি নিত্যচরণ একমুখ 'উদ্ধত উদাসীন' হাসি নিয়ে চারদিক পুড়িয়ে ছারখার করতে উদ্যত—

> "... তিনটে সৃষ্টি এক হয়ে গেল। আর কে যেন সেই আগুনের স্রোত মন্থন করে উঠে দাঁড়িয়ে গমগম করে বলল, আমি এসেছি। ... আমাকে ফাঁকি দিতে পারোনি। ... তাদের কলোনিটা পুড়ছে। তারপর আগুনের রথ কলকাতার দিকে ছুটল। যে হোটেল চাকরি করে তার কেবিনের পর্দা পুড়ে গেল। আগুন নিষ্ঠুর শাসকের মতো চারদিকে সবকিছু পোড়াতে লাগল। একটা শিশু-ছেলে পুতুল হাতে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে পালাল। আগুন ছড়াল। সমস্ত মানুষ হা হা করে নদীর দিকে ছুটল। নদী শুকিয়ে মরুভূমি। পদ্মা শুকিয়ে মরুভূমি। দেশ শুকিয়ে মরুভূমি। পৃথিবীটা মরুভূমি। আগুন ছুটে আসছে। ..."[৬১]

আমরা জানি রামায়ণে সীতা উদ্ধারের জন্য জটায়ু প্রাণ দিয়েছিলেন। আহত ডানাহীন জটায়ুর শেষ লড়াই ছিল সীতা উদ্ধারের। আলোচ্য গল্পে দুর্গা আধুনিক সীতা। দুর্গাকে উদ্ধারের জন্য তাই ডানাহীন নিত্যচরণের আগুনের মধ্যে ভয়ানক নৃত্য। সমস্ত অশুভ-সংকীর্ণতাকে আগুনে পোড়াতে চায় নিত্যচরণ।

আগুনে পুড়িয়ে সমস্ত কিছুকেই বিশুদ্ধ করতে চায় নিত্যচরণ। লেখকের সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা নাশের সৈনিক নিত্যচরণ ও দুর্গা। শুভবুদ্ধির উদয় ও সুস্থির পৃথিবীর আশায় নিত্যচরণ-দুর্গার সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত রেখেছেন গল্পকার। আর তাই প্রাচীন পুরাণের আবহমাত্রে 'জটায়ু' গল্পটি বিশ শতকের সংগ্রামী মানুষের নব্যপুরাণ হয়ে উঠেছে।

অশ্বমেধের ঘোড়া

'অশ্বমেধের ঘোড়া' ১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'ছোটগল্প' শারদীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। এই সালেরই অগ্রহায়ণ মাসে বিমল কর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প'তে তা পুনর্মুদ্রিত হয়। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' দীপেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং আলোচিত গল্প।

এ গল্প আর্থ-সামাজিক চাপে বলিপ্রদত্ত দুটি যুবক-যুবতীর গল্প। কাঞ্চন একটি কলেজের অধ্যাপক, রেখা সরকারী অফিসের কেরানি। তারা লুকিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে কিন্তু পারিবারিক দায়বদ্ধতার কারণে তা গোপন রাখতে হয়েছে এবং একই কারণে বিয়ের একবছর পরও তারা আগের মতোই। কাঞ্চনের ভাবনায় জানতে পারি বিয়ের একবছর পরেও সে রেখাকে নতুন করে কিছুই জানেনি— 'রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না।' ঘটনার দিন তাদের বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। পথ চলতে কানে আসে সানাই-এর চন্দ্রকোষ। মনে হয় পরিবেশ যেন তাদের বিয়ের প্রথম বার্ষিকীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আজ রেখা স্বতন্ত্র— সে রাস্তায় ফুলের মালা কেনে, রাস্তার মধ্যেই কাঞ্চনকে মালাটা খোঁপায় বেঁধে দিতে বলে। বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ঘটনা এগিয়ে যায়। লেখকের কলমে ধরা পড়েছে কাঞ্চনের যন্ত্রণা যা আসলে সে সময়ের যৌবনের যন্ত্রণা—

> "ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, এক পেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ আকর্ষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া।"[৬৩]

জনারণ্য ও ব্যস্ত কলকাতায় খানিক নিভৃতির জন্য দরকষাকষি করে রেখা-কাঞ্চন একটি ঘোড়ার গাড়িতে চাপে। কিন্তু দুপাশ খোলা ফিটনের আবেষ্টনে রেখা কুণ্ঠিত, সংকুচিত। কেননা—

> "ফিটনের দু-পাশ খোলা। সত্যিই চারদিকে অমৃতের অজস্র সন্তান। কে না কে দেখছে জানি না। রেখার পরিবার আছে, সমাজ আছে, আমি একটা পুরুষ। ওহো, আমি পুরুষ। বেড়ে।"[৬৪]

আচমকা বৃষ্টি আসায় গাড়োয়ান ফিটনের দুধারের পর্দা নামিয়ে দেয় 'আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' ঘিঞ্জি কলকাতা শহরে যে নির্জনতা ও অবসর তাদের কাছে একান্ত কাঙ্ক্ষিত ছিল তা হঠাৎ পেয়ে যাওয়ায় দুজনেই স্তব্ধ। স্তব্ধতা ভাঙার পর কিছু সংলাপ ও মুহূর্তই গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। গল্প শেষে তথাকথিত বিবাহবার্ষিকীকে মনে রেখে রেখার অনুনয়ে কাঞ্চন রেখাকে মালা পরিয়ে দিতে যায়। সেই দৃশ্য গাড়োয়ান চকিতে দেখে। বিনিময়ে দাবি করে বেশি ভাড়া— 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়া ভি দিবেন না?' রেখা চমকে কানে হাত দেয়। বিমূঢ় কাঞ্চন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি। তারা কাঁদেনি এই অপমানে। 'কারণ একান্তে কাঁদার মতো কোনো আশ্রয় তাদের জানা ছিল না।'

এ গল্প সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন—

> "এ আমাদের হওয়া না-হওয়া সময়ের যৌবন আর ভালোবাসার গল্প। সমকালীন ফ্রেমে যেখানে চিরায়তকে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। নিটোল কোনো কাহিনী নেই, আছে তার আভাসমাত্র। সময়ের ধারাবাহিকতাকে বারবার ভাঙা হয়েছে। স্মৃতি অনুষঙ্গ তথা ভাবনাপ্রবাহ হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে অতীত বর্তমানে কাটা ছেড়াভাবে আলো জ্বলছে। দুটি শুদ্ধ হৃদয় পরস্পর মিলতে চায়।"[৬৫]

কিন্তু পাঠক দেখেছে হৃদয়দুটি মিলতে পারছে না, লেখকের কথার সূত্র ধরে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি এই পরিস্থিতির পিছনে রয়েছে সে সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ। এই ভঙ্গুর অর্থনীতি ও সমাজনীতির নিগ্রহে যৌবন ও ভালোবাসা আর্তনাদ করেছে। তাই বিয়ের একবছর পরেও তারা মিলতে পারে না। একবছর আগের এই দিনটিতে অর্থাৎ রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন ফেরার পথে একসঙ্গে বাসে উঠে রেখার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কাঞ্চন ও রেখাকে অপরিচিতের মতো ফিরতে হয়েছিল। আজও গাড়োয়ানের কটূক্তিতে প্রায় প্রতিবাদহীনতায় রেখা-কাঞ্চন অপরিচিতের মতোই রাস্তায় চলে। একবছর দীর্ঘসময়। স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কে যে প্রাপ্তি ও পুষ্টি আসা সম্ভব, তাদের জীবনে দীর্ঘ একবছরে তার কোনো সুযোগ আসে না। এ গল্পে বারে বারে সময়ের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে কাঞ্চনের চেতনার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ায়। তার এই হারিয়ে যাওয়ায়। তার এই হারিয়ে যাওয়া সময়ের ভাবনার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে দিলে সমসাময়িক পরিস্থিতিটা আরও স্বচ্ছ হয়ে আমাদের সামনে ধরা পড়বে—

ক. " ... আমরা শুধু রাস্তাটুকুর খবর রাখি। হাঁটতে হাঁটতে বড়জোর ময়দান অব্দি যাব। বড়জোর চা খাব এক পেয়ালা। আলো আর অন্ধকারের সমারোহ দেখব। তারপর বাস ধরব। রেখার পাশে খালি জায়গা থাকলেও আমাকে আলদা বসতে হবে, বা দাঁড়াতে। ভিড় ঠেলে নেমে যাবার সময় রেখা হাতে একটা টিকিট গুঁজে দিয়ে যাবে। সুযোগ পেলে কিছু একটা বলবে। নয়তো অপরিচিতার মতো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবে।"[৬৬]

খ. "আমার পকেটে বিয়ের দলিল। রেখার হাতটা ছুঁতে ইচ্ছে করছে। রেখাকে একবার বউ বলে ডাকতে— আহ, কি আশ্চর্য ইচ্ছে। আমরা পাশাপাশি হাঁটছি অথচ নীরবতা। বিয়ের পর একান্তে প্রথম কথা কি হবে, কি হতে পারে? আমি অস্ফূটে বলেছিলাম গঙ্গায় বসলে হয়হু রেখা অস্ফূটে বলেছিল, হুঁ।"[৬৭]

কাঞ্চনের জীবনে এই যে মানসিক টানাপোড়েন তার জন্য দায়ি তার মধ্যবিত্ত মানসিকতা। সে পারিবারিক দায়বদ্ধতার কারণে পারছে না রেখাকে বধূর স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে, আবার যাদের জন্য তার এই আত্মত্যাগ তাদের প্রতিও সে বিরক্ত-ক্ষুব্ধ। 'আর দুঃখ পাই। নিজের কাছে ক্রমাগত ছোট হতে থাকি। অথচ জানি না ঠিক কি চাই।' কাঞ্চনের ভাবনায় পাই দীপেন্দ্রনাথের সময়কার কথা—

"এ-যুগের নিয়তিই হল বাল্য এবং প্রৌঢ়তা— মধ্যিখানে বিশাল চড়ায় ইচ্ছে ও অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা আর কর্তব্যের বিরোধে— পোকার মত গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি— অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র।"[৬৮]

কিন্তু যে কোনো রচনা তখনই কালোত্তীর্ণ হয় যখন সমসাময়িকতাকে ছাড়িয়ে চিরন্তনতা প্রবাহিত হয়। এ গল্প সার্থক। সব কালের সব যুগের যুবক-যুবতীর কাহিনি এটি। তাই দেখি এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা ভালোবাসে এবং ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা করে। ঘটনা কিছু থাকলেও গল্পে মূলত অনুভবেরই প্রাধান্য। বাইরের পরিস্থিতি-পরিবেশ, কাঞ্চনের আত্মকথন ও আত্মসমীক্ষা, রেখা-কাঞ্চনের নাটকীয় সংলাপ গল্পটিকে বহুমাত্রিকতা দান করেছে। লেখকের সিচুয়েশন তৈরির অসাধারণ দক্ষতা চোখে পড়ার মতো। ছোটো ছোটো কাটাছেঁড়া বাক্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং পাঠকের

অনুভূতির গভীরে ছড়িয়ে যায় বিষয়। কাঞ্চনের বর্তমান অসহায় অবস্থা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে—

> "রেজিষ্ট্রারের চেম্বারটা মনে পড়ল— ছোট, ঠাসা। রেস্তোঁরার কেবিনটা মনে পড়ল— ছোট, ঠাসা। শোবার ঘরটা মনে পড়ল— ছোট, ঠাসা। আমার দমবন্ধ হয়ে হয়ে এল।"[৬৯]

নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক পুরাণ অনুষঙ্গ এনেছেন। প্রাচীন ভারতে প্রতিপত্তিশালী রাজারা নিজেদের মানস অভিলাষ পূরণের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞ করতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করবার পর একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত তেজস্বী বেগবান অশ্বের কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হতো। বিভিন্ন রাজ্যের উপর দিয়ে অশ্বটি যেত। যে রাজ্য সমাদর করে অশ্ব এবং অনুগামীদের আপ্যায়ণ করত তারা বশীভূত হতো এবং উক্ত প্রতিপত্তিশালী রাজার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতেন। যে রাজ্য বশ্যতা স্বীকার করত না তার সঙ্গে যুদ্ধ হত। অভিলষিত রাজ্য পরিক্রমার পর একটি যজ্ঞে এই অশ্বটিকে আহুতি দেওয়া হত। এই যজ্ঞকে বলে অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তেজস্বী-বেগবান যজ্ঞাহুতি দেওয়া অশ্বটিকে বলা হয় অশ্বমেধের ঘোড়া অর্থাৎ অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া। আগেই উল্লেখ করেছি যে আলোচ্য গল্প সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'এ আমাদের হওয়া না-হওয়া সময়ের যৌবন আর ভালোবাসার গল্প'। এখানে রেখা-কাঞ্চনের জীবনাশ্রিত প্রেম-ভালোবাসা গাড়োয়ানের কটূক্তিরূপ যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে। যুগের নিয়তি এটাই। তাই রেখার নির্মল ঝিরঝিরে হাসি অশ্বক্ষুরের ধ্বনিতে মিলিয়ে যায়। কাঞ্চনের মনে হয়—

> "অশ্বক্ষুরের ধ্বনি চেতনা অবশ করছে। এই আমার শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড়-কন্যা আর্য-ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় হা হা করে কেঁদে উঠল। তারপর চেঙ্গিজ খাঁর অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এখন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঠে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বাজি দৌড়য়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াই টাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে। কাঞ্চন চোখ বন্ধ করে ক্ষুর এবং হ্রেষাধ্বনি শুনতে লাগল। সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়।"[৭০]

সুতরাং গল্পের বিষয়-ভাবনা ও পরিণতিতে পৌরাণিক অনুষঙ্গ আধুনিক জীবনসংকটে মিশে গল্পের নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১৩৬৯ সালের আশ্বিন মাসে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। সরকার কর্তৃক কৃষিউন্নয়ন ও শিল্পউন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় জনগণের প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সময়ও সাধারণ মানুষের দুর্দশা-যন্ত্রণার বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য গল্পে।

আলোচ্য গল্পে শিবপদ মুখ্য চরিত্র। দুর্ঘটনায় আহত একটি ছেলেকে শিবপদ হসপিতালে নিয়ে যাওয়া ও সারাদিনের হসপিতালের অভিজ্ঞতারই বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য গল্পে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নানান সমস্যার পাশাপাশি এ-গল্পে রয়েছে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের নানা ছবি।

দুর্ঘটনায় আহত ছেলেটিকে দেখার জন্য লোকজনের ভিড় জমলেও তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। সকলেই ব্যস্ত নিজের নিজের কাজ নিয়ে। একমাত্র শিবপদ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। আঘাতপ্রাপ্ত ছেলেটিকে শিবপদ একই হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের সারাদিনের শিবপদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লেখক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের সামনে। আহত চরণকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য শিবপদকে নানান ঝামেলা পোহাতে হয়। এমনকী ডাক্তারের জেরারও সম্মুখীন হতে হয় শিবপদকে। ডাক্তারের 'অবিকল রোগীর মতো' চেহারা যেন সূচিত করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরবস্থাকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দালালের অত্যাচার আজকের দিনেও বর্তমান। নিবারণ নামের চরিত্রটি আলোচ্য গল্পে আসলে একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী। কিন্তু আমরা অবাক হই হাসপাতালে তার কর্তৃত্ব দেখে। ডাক্তার-নার্স-কর্মচারীদের তিনি যেন নিয়ন্ত্রক। অবশ্য গল্পে নিবারণ চরিত্রটি একই সঙ্গে ধান্দাবাজ ও অসহায়। নিবারণ মিথ্যে কথা বলে ডাক্তারের থেকে ঔষধ নিয়ে যায়। শিবপদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ধরা পড়ে নিবারণের চরিত্র। নিবারণের অসহায়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে—

> "বড় শখ ছিল কুমোরটুলির কাত্তিকের মতো একটা ডবকা ছেলে হবে—তার মুখের দিকে চেয়ে সব দুঃখকষ্ট ভুলব। চেয়ে দেখুন, আমি মানুষটা সুপুরুষই ছিলাম। আমার ছেলে বলতে কেমন লজ্জাই করে। আর, সকলেই তো বোঝে না। খেয়ে এমন হয়েছে। এমনভাবে তাকায় যেন জন্মো দিয়েই অপরাধ করেছি।"[৭১]

হাসপাতালেই চলছে রক্ত কেনা-বেচার বাজার। রক্ত বিক্রি করে অনেকেই অর্থ উপার্জন করছে। কানাইয়ের ভাষায় 'মুফতে' রোজগার। রক্তের মূল্য এখন মানুষের কাছে নগণ্য। কারণ রক্ত বিক্রির অর্থে কেউ সিনেমা দেখে আবার কেউ জুয়া খেলে। অবশ্য এই অনাচারের মধ্যেও আশার বার্তা পেয়েছে শিবপদ। কারণ সেখানেই আবার কেউ ইউরি গাগারিনের আত্মজীবনী পড়ছে। গল্পের শেষে শিবপদ চরণকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। কিন্তু রস্তার আরেকজন অসহায়কে দেখলেও সে এগিয়ে যায় না সাহায্য করার জন্য।

আলোচ্য গল্পে একমাত্র শিবপদ চরিত্রটিই আলোচনার অবকাশ রাখে। শিবপদ মধ্যবিত্ত হলেও অন্যের সাহায্যের জন্য নিঃস্বার্থ একাই এগিয়ে গিয়েছে। সমালোচক লিখেছেন—

> "যদিও মাঝে মাঝে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে ফেলে দেয়। পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে যোগ্য ভাড়া দিতে চাওয়ার মধ্যে তার সততার পরীক্ষা হয়ে যায়। 'লোকটি'ও শেষপর্যন্ত শিবপদকে ভালোমানুষের শিরোপা দিয়েছে। কানাইয়ের সাথে কথাপ্রসঙ্গেও শিবপদর ভালোমানুষের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। মণিকার সাথে এয়ারপোর্ট যাওয়ার প্ল্যান বানচাল হওয়ায় শিবপদ সংশয়ে ভোগে। তার এই মানসিক টানাপোড়েনই চরিত্রটিকে বেশি সজীব করে তুলেছে। ড্রাইভারের কটুকথায় অপমানিত হয়ে সে আত্মবিশ্লেষণ করে। বোঝে রাস্তার অন্য সবার মতো নাগরিক কর্তব্য ও আপন নিরাপত্তার 'আশ্চর্য সমন্বয়' করতে পারেনি জন্যই সে এয়ারপোর্টে না থেকে হাসপাতালে দাঁড়িয়ে আছে।"[৭২]

গল্পে শিবপদের আত্মসমীক্ষায় তাকে বিচক্ষণ বলেই মনে হয়েছে। নিজের দুর্বলতা শিবপদ অনায়াসেই স্বীকার করে—

> "... শিবপদ তারপর খুব দুঃখিত হয়ে ভাবল— এই যে অফিস কামাই করে মণিকার সঙ্গে তার এয়ারপোর্টে যাবার কথা, এর পেছনে কি শহরতলীর নির্জন পথে নিশ্চিন্ত পরিভ্রমণ আর বীরপূজা ও নিজেদের সভ্যতা-সচেতনতার অহমিকা পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাই ক্রিয়া করেনি? নইলে নিছক খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়া ছাড়া গাগারিন সম্পর্কে সে কতটুকুই বা জানার চেষ্টা করেছে।"[৭৩]

গল্পটিতে দীপেন্দ্রনাথ শিবপদের মাধ্যমে সমসাময়িক সংকটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সারাদিনের অভিজ্ঞতায় শিবপদ উপলব্ধি করেছে নিরাপদ দূরত্বে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। তাই অসুস্থ মেয়েটিকে দেখে সে ভাবে— 'এক্ষেত্রে তার কিছুই করার নেই।' হাসপাতালের পাশেই পীড়ের দরগায় মানুষের ভিড় দেখে বোঝা যায় বিশ শতকেও মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনেও মানুষের সংশয়-কুসংস্কার সভ্যতার নগ্ন দিকটিকেই সূচিত করে।

সূত্রনির্দেশ

১. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২২
২. দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ ১, দেবেশ রায় (সম্পা), ভূমিকা অংশ, কলকাতা, পৃ. ৩
৩. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৩
৪. দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ ১, দেবেশ রায় (সম্পা), ভূমিকা অংশ, কলকাতা, পৃ. ২
৫. তদেব, পৃ. ২
৬. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৪
৭. দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ ১, দেবেশ রায় (সম্পা), ভূমিকা অংশ, কলকাতা, পৃ. ৪
৮. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৫
৯. দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ ১, দেবেশ রায় (সম্পা), ভূমিকা অংশ, কলকাতা, পৃ. ৬
১০. তদেব, পৃ. ৭
১১. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৬
১২. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ৫১
১৩. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৭
১৪. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ৫৪
১৫. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৯
১৭. তদেব, পৃ. ৩০
১৮. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ৬০
১৯. তদেব, পৃ. ৬০-৬১
২০. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩১
২১. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ১৮

২২. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩৫

২৩. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ১২

২৪. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩৬

২৫. তদেব, পৃ. ৩৬

২৬. তদেব, পৃ. ৩৭

২৭. তদেব, পৃ. ৩৭

২৮. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ১১৪

২৯. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩৯-৪০

৩০. তদেব, পৃ. ৪৭

৩১. তদেব, পৃ. ৪৭-৪৮

৩২. তদেব, পৃ. ৫৩

৩৩. দিবারাত্রির কাব্য, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পৃ. ১১৭

৩৪. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ১৬৩

৩৫. তদেব, পৃ. ১৬৮

৩৬. তদেব, পৃ. ২১৮

৩৭. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৫৭-৫৮

৩৮. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ২১৯

৩৯. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৫৮

৪০. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ২১৯

৪১. তদেব, পৃ. ২২১

৪২. তদেব, পৃ. ২২২

৪৩. তদেব, পৃ. ২২৫-২২৬

৪৪. তদেব, পৃ. ২২৯

৪৫. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৬৮-৬৯

৪৬. দিবারাত্রির কাব্য, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, পৃ. ১৭৯

৪৭. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৭০

৪৮. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ২৪৮

৪৯. তদেব, পৃ. ২৫১

৫০. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৭১

৫১. তদেব, পৃ. ৭২-৭৩

৫২. তদেব, পৃ. ৭৩

৫৩. তদেব, পৃ. ৭৩

৫৪. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ২৩৫

৫৫. তদেব, পৃ. ২৪১

৫৬. তদেব, পৃ. ২৭৫

৫৭. তদেব, পৃ. ২৭৬

৫৮. তদেব, পৃ. ২৮০

৫৯. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৭৫-৭৬

৬০. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ২৮০

৬১. তদেব, পৃ. ২৮১

৬২. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৭৮

৬৩. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ৩০৩

৬৪. তদেব, পৃ. ৩০৪

৬৫. শ্রেষ্ঠ গল্প-শ্রেষ্ঠ লেখক, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭৪

৬৬. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ২৯৯-৩০০

৬৭. তদেব, পৃ. ৩০১

৬৮. তদেব, পৃ. ৩০৩

৬৯. তদেব, পৃ. ৩০৫

৭০. তদেব, পৃ. ৩০৬-৩০৭

৭১. তদেব, পৃ. ৩৬৯

৭২. কথাপ্রগতি: দীপেন্দ্রনাথ, রীতা মোদক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১০৩

৭৩. গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), কলকাতা, পৃ. ৩৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার শৈলী

বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে দীপেন্দ্রনাথ নামটি বিশেষ পরিচিত নয় বললেই চলে। তাঁর গল্পের সংখ্যাও কম। মাত্র সাড়ে চার দশকের আয়ুসীমার মধ্যে দীপেন্দ্রনাথ রচনা করেছেন মোট একান্নটি গল্প। তবে তাঁর চারটি গল্পের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।[১] বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, সম্পাদক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংগঠক, অজস্র রিপোর্টাজের প্রণেতা— সব কিছু মিলিয়েই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুব্রতী দীপেন তাঁর কথাসাহিত্যে আত্মসংকট ও ব্যক্তিগত অনুভূতির মিশ্রণে তৈরি করেছেন এক ব্যতিক্রমী আঙ্গিক। বীতশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> "... স্বল্প আয়ুষ্কালের এই মানুষটি, কম করেও তিনদশকের এই লেখক-ব্যক্তিত্ব, আবিষ্কার করে চলেছিলেন বাংলা ভাষার সেই স্বভাব ঃ সে একই সঙ্গে অন্তরঙ্গ এবং জনগণের, প্রাতিস্বিকি অথচ সম্প্রদায় সচেতন। বীক্ষানির্ভর এবং কল্পনাপ্রবণ তাঁর এই বাংলাগদ্য ক্রমশ সুস্পষ্ট করে তুলছিল তাঁর একান্ত নিজেকে; দেখিয়ে দিচ্ছিল কিভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন বিশেষ আর সামান্য, কোথায় তিনি অন্যের থেকে একেবারেই আলাদা, এবং আরও কোথায় তিনি সকলের সঙ্গে একাকার।"[২]

দীপেন্দ্রনাথের প্রতিদিনের পরিস্রুত কল্পনা প্রকাশক্ষম করে গড়ছিল তাঁর অস্তিত্বকে তাঁর রচনায়। সজল চোখের নজরে এসে পড়ে বস্তুবিশ্বের প্রতিফলন। বাংলা ভাষার সূত্র ধরে তিনি চিনে নেন তাঁর অবস্থানকে—

> "পা-টাকে মাড়িয়ে ধরেছে — সেই শ্রমিকটি, নিশ্চয়ই উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছে, জনসংঘী! শালা খোট্টা। ছি ছি মণিমোহন ... হুঁ-শি-য়া-র ... সে অস্ফুটে উচ্চারণ করল — মা, মাগো।"[৩]

'শোকমিছিল' দীপেন্দ্রনাথের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। গল্পটিতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির যাপিত পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে যে সাংলাপ ও মনোকথন রূপ পেয়েছে— বাংলাভাষী যেকোনো পাঠক তার পর্যবেক্ষক হতে পারেন। বিনয়ভূষণের রাজনৈতিক পরিবার উপন্যাসে যে অব্যবহিত আবহের তৈরি করেছে তা সত্তর দশকের কলকাতা ও শহুরতলির বিস্ফোরক বাতাবরণ। মার্কসবাদের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিনয়ভূষণ তাঁর বর্তমান সক্রিয়তা ও অতীত অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করতে চাইছেন। সত্তর দশকের ভারতের মার্কসবাদ-সংক্রান্ত ভাবনা ও বাগ্‌ব্যবহারের একটি রূপ তৈরি

করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ গল্পটিতে। বাংলা শব্দভান্ডারে লেখকের রয়েছে নির্বোধ অধিকার। ব্যাকরণগত দক্ষতা তাঁর বাচনভঙ্গিকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছে। আর বাংলা ধ্বনির মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বস্তুগত ভিত্তিকে। গল্পে রয়েছে—

> "এক বিচিত্র কোরাস বিনয়ভূষণকে আক্রমণ করল। কেউ শপথ ঘোষণার মতো গম্ভীর গলায়, কেউ চটুল গানের সুরে, কেউ খি-খি-হাসির ঢঙে উচ্চারণ করছে— সাড়ে তিন পার্সেন্ট। হাতের আঁজলায় তেঁতুলের বিচি নাড়লে-চাড়লে যেমন শব্দ হয়, যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও বলে বিজুরা যেভাবে নাচত, কানে সুড়সুড়ি দিয়ে কারা সেইভাবে যেন অবিরাম গুনগুন করছে — সাড়ে তিন পার্সেন্ট, সাড়ে তিন পার্সেন্ট।"[৪]

দীপেন্দ্রনাথের 'শোকমিছিল' গল্পের ভাষায় আমরা প্রবণতাকে বর্গীকৃত হয়ে উঠতে দেখি। গল্পে ভাষিক পরিস্থিতি নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন দীপেন্দ্রনাথ। যেমন—

> "কমরেড দাদা, কমরেড বৌদিকে হামিলোগের লাল সালাম জানাবেন, বলবেন শশী বলেছে অজুর খুনের বদলা না নিলে শশী খানকীর ব্যাটা। না না, উ কথাটি বলবেন না। বলবেন শশী বলেছে— কমরেড ভাবী, রোও মৎ। শশীরা বদলা নিবে।"[৫]

উক্ত উদ্ধৃতিতে শশী খুনের বদলা নেওয়ার প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছে। আর এই আলোচনায় দুটি দৃষ্টিকোণ লক্ষিত হয়েছে। রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের বর্বরতা প্রকাশ পেয়েছে 'খানকীর-ব্যাটা' গালির মাধ্যমে— তা একদিকে সার্থকভাবে বিম্বিত। অপরদিকে 'খানকির-ব্যাটা' অভদ্র উচ্চারণের মাধ্যমে অসভ্যতার যে প্রকাশ সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের সফল প্রয়াস। রাজনীতিক দলের ভাড়াটে গুণ্ডাদের পেশার সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খেয়েছে গল্পে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটির আধুনিকতা নির্ভর করে আছে কথন ভঙ্গির অনন্য স্বভাবে। গল্পের আখ্যান অংশ সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য আখ্যানকে অসামান্য দক্ষতায় চেতনা-অবচেতনের স্তরে জুড়ে দিয়েছেন গল্পকার। সময়ের সরলরৈখিক গতিকে ভেঙে দিয়ে পাত্র-পাত্রীর একদিন-প্রতিদিনকে চিরদিনের বৌদ্ধিক উচ্চতা ও আদল দিয়েছেন গল্পকার। আখ্যানের চরিত্রও স্থির নয়। কেন্দ্রীয় অনুভবও বারবার বদেলে গেছে প্রথম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষে। গল্পের বয়ান কোথাও লেখকের, কোথাও বা নায়ক কাঞ্চনের। আবার এই দ্বিমাত্রিক ন্যারেটিভের স্থান বদল ঘটেছে বারবার। লেখকের সঙ্গে কাঞ্চনের একাকার অস্তিত্ব অনেকসময় বিস্ময় সৃষ্টি করে পাঠকমনে। দীপেন্দ্রনাথ কখনো ঘটনার মধ্যে থেকে আবার কখনো ঘটনার বাইরে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবধানে দাঁড়িয়ে অনুভূতিশীল মানুষের অসহায়তার গল্প লিখেছেন। যে গল্পের মেজাজ লিরিক্যাল, কিন্তু পরিণতিতে

আছে গদ্যের কড়া হাতুড়ির প্রচণ্ড প্রহার। গল্পে রয়েছে—

"গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল — বাবু?

কী?

খিরিদপুর"[৬]

গাড়ি থেকে নেমে ওরা ভাড়াটা মেটাতে গিয়েই বিপত্তি —

"সে চটে উঠে বলল 'সে কী? পাঁচ টাকার কম হবে না।'

কাঞ্চন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল 'কেন? তুমিই তো বলছিলে।'

গাড়োয়ান বলল 'ফুর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াবি দিবেন না?"[৭]

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে নানা স্থানে কিছু আশ্চর্য প্রতীকের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন গল্পে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এসেছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। গল্পে কখনো কখনো মনে হয়েছে এমন সুরের আবহ। বাস্তবের পরিবর্তে সুর শুধু বাজছে কাঞ্চনের কল্পনায়। সানাইয়ের বিষণ্ণ-মধুর সুরে গল্পের বিস্তৃতিকে বোঝানোর প্রয়াস করেছেন গল্পকার। কাঞ্চন-রেখার বিয়ে থেকে বিবাহ বার্ষিকী পর্যন্ত।

পুরাণ ও পরম্পরা অনুযায়ী বলা যায় অশ্বমেধের ঘোড়ারা কখনো নিজের জন্য যুদ্ধ করেননি। তারা যুদ্ধ জয়ের পতাকা বহন করেছে। হয়ে উঠেছে বীরত্বের প্রতীক। শেষে তাদের হত্যা করে আর্য সম্রাটরা হয়েছেনে রাজচক্রবর্তী। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের অন্ধকার আস্তাবলেও ঠাঁই হয়নি সেইসব হতভাগ্য চারপেয়েদের। কিছু মানুষকেও ঠিক এভাবেই ব্যবহার করেছে আবহমানের সমাজ-সময়-ইতিহাস। তারা যুদ্ধ করেছে, জিতেছে কিন্তু জয় উপভোগ করতে পারেনি। আলোচ্য গল্পে বাস্তবে পৌরাণিক 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ নেই, তবু একটা ঘোড়া আছে। ঘোড়াটিকে কেন্দ্র করেই রয়েছে আবহমানের চলচ্ছবি। রেখা আর কাঞ্চন ঘোড়ার গাড়ির ছোট্ট পরিসরে যেন নিরীক্ষণ করছে সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার—

"অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড় কন্যা আর্য ঘোড়াসওয়ারের পায়ের তলায় হাহা করে কেঁদে উঠলো। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এমন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঝে পাটোয়ারি বুদ্ধিতে বাজি দৌড়ায়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল , মাত্র আড়াইটার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে।"[৮]

বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা ছোটোগল্পে দেখা দেয় এক নতুন আন্দোলন। এই আন্দোলনের মুখপত্র ছিল 'ছোট গল্প ঃ নতুন রীতি' নামে একটি পত্রিকা। এর নেতৃত্বে ছিলেন বিমল

কর। উক্ত পত্রিকাটি ছিল নিতান্ত স্বল্পায়ু— প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচটি মাত্র সংখ্যা। কিন্তু ওই পাঁচটি সংখ্যাই সেদিন বাংলা গল্পসাহিত্যে এক স্পষ্ট পালাবদল ঘটিয়েছিল। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম গল্প 'জটায়ু'। বলা যায় পৌরাণিক অনুষঙ্গের শ্রেষ্ঠ গল্প। পক্ষীরাজ গরুড়ের অগ্রজ সূর্যসারথির পুত্র জটায়ু। আকাশপথে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধকালে প্রাগৈতিহাসিক জটায়ুর ছিন্নপক্ষ হওয়ার প্রসঙ্গকে লেখক আলোচ্য গল্পে ব্যবহার করেছেন। গল্পের মূল চরিত্রের অবয়বে তিনি সঞ্চারিত করেছেন সমস্ত পুরাণ অনুষঙ্গকে। গল্পে নেত্যচরণের লৌকিক নৃত্য সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় লেখক যা সৃষ্টি করেছেন — তা সাম্প্রতিক ও নব্যপুরাণ বলে বিবেচিত হতে পারে নির্দ্বিধায়। 'জটায়ু'র মতোই কঠোর সংগ্রামী নেত্যচরণ সমস্ত সন্দেহ, ভয়, আতঙ্ক, অস্থিরতা, ত্রাস থেকে রক্ষা করতে চায় দুর্গাকে। ছুটন্ত ট্রেনের দুর্ঘটনায় কাটা পড়ে যায় নেত্যচরণের দুটি পা। গল্পে নেত্যচরণ যেন 'জটায়ু'। পুরাণ ও স্মৃতির অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে নেত্যচরণের ভূমিকা, দুর্গার জীবন-কাহিনি উন্মোচনে অনেকটাই প্রতীকী হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতীকী ব্যঞ্জনাকে স্পষ্ট করতেই লেখক বারবার সৃষ্টি করেন অলৌকিক মায়া—

> "তারপর আবার অন্ধকার। কিছু কিছু নানা চেহারার গাছ আকাশ-মাটি ও শূন্যতার সঙ্গে কালিঝুলি মেখে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ছিটিয়ে আসে। ... অন্ধকারটা কাদার মতো থিকথিক করছিল। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা, কোথাও আলো-অন্ধকার কিছু নেই।... হিম পড়ছে, যেন ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার।"[৯]

আলোচ্য গল্পে সমস্ত পরাভবের মধ্যেও জীবনকে জিতে নেবার সেই কঠোর সংগ্রামেই দীপেন্দ্রনাথ চরিত্রকে চারিত্র্য দান করেছেন। গড়ে তুলেছেন নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় এক একটি জ্যান্ত পুরাণ। দুর্গার ভীতি, একাকিত্ব, অতীতচারিতা কোনো সময়েই তাঁকে ছেড়ে যায়নি। লেখক যেতেও দেননি। তাই কেউ কারোর সঙ্গে হেসে কথা বললে দুর্গার বুক ছাঁৎ করে ওঠে—

> "কেউ তাকালে আমার পালাতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ অপরিচিত কাউকে দেখলে আমার হাত-পা কাঁপে, ভিড় সহ্য হয় না — আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছেঃ সব সময় কি একটা যড়যন্ত্র চলছে বুঝতে পারি। আমি জানি আস্তে আস্তে এখানেও তার জাল ছড়াবে।"[১০]

আসলে উক্ত গল্পের বক্তব্যকে তীব্র জনমুখী করে তুলতেই পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন গল্পকার। আর এই অসামান্য ছোটোগল্প 'জটায়ু'-কে দাঁড় করিয়েছেন দেশীয় মহাকাব্যের ভিত্তিমূলে। দীপেন্দ্রনাথের পৌরাণিক আশ্রয়ে একটি প্রাগৈতিহাসিক বৃদ্ধ পাখি এসে ধরা দিল একালের যীবনযন্ত্রণায়। সীতা উদ্ধারের প্রচেষ্টায় বৃদ্ধ জটায়ু-র জীবনদায়ী ইচ্ছা এবং তার আত্মত্যাগের ঘটনার সঙ্গে আমাদের নেত্যচরণকে মেলাতে তাই কোনো অসুবিধাই হয় না।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বর সভা' গল্পটি তিনজন আত্মবিচ্যুত যুবকের গল্প হলেও নামকরণ এবং মূল থিমের মধ্যে মহাকাব্যিক সেই বিখ্যাত ঘটনার কথাই স্বাভাবিকভাবে স্মরণে আসে। গল্পে গল্পকার বিশ শতকের পটভূমিতে, বিপত্তি মূল্যবোধ আর মনোহীনতায় জীর্ণ-দীর্ণ ব্যক্তিত্বের স্থাপত্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন মহাকাব্যিক মিথের। গল্পের চরিত্ররা ভিন্ন স্বভাবের হলেও পরিচয় হারানো যুবকের দল জীবনকে জিতে নেওয়ার প্রতীকী জুয়াখেলার ছক সাজায়। এ-দিক থেকে দেখতে গেলে এই জুয়াখেলা তাদেরই আত্ম-আবিষ্কারের করুণ-প্রয়াস। বাজির প্রক্রিয়ায় হঠাৎই নাম প্রস্তাব হয় 'দ্রৌপদী'র। পৌরাণিক মহাকাব্যের আবহমান অনুষঙ্গ এসে উপস্থিত হয় একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে। গল্পে রয়েছে—

> "তারপর একটা সময় এল, যখন আর কোনও মেয়ের স্মৃতি মনে আসছে না। সুধাংশু বলল, 'ঠিক আছে। স্রেফ নামের ওপর হোক। কানে শোনা, বইয়ে পড়া।'
>
> অখিল হঠাৎ উঠে বসে সাজেস্ট করল, 'দ্রৌপদী'।
>
> সুধাংশু আর বিনয় পরস্পরের মুখের দিকে চমকে চাইল। তারপর অখিলের দিকে। আর তিনজনের চোখেই কেমন নিষ্ঠুর উত্তেজনা প্রকাশ পেল।
>
> ...
>
> ...
>
> তিনভাগে তাস পড়ল। ওরা দুজন নিজের তাস তুলে নিল। বাকি তিনটে তাসের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু ভাবল, সময়; বিনয় ভাবল, নিয়তি; অখিল ভাবল, আমি। তারপর দ্রৌপদীর জন্য শেষ বাজি আরম্ভ হল।"[১১]

তিনটি যুবকের সমস্ত মোহভঙ্গতা সত্ত্বেও যে জীবন-তৃষ্ণা, জীবনকে জিতে নেওয়ার প্রতীকী ক্ষেত্রে যে গল্পকার ওদের এনে উপস্থিত করেছেন — তা গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক দায়বদ্ধতা।

দীপেন্দ্রনাথের 'নরকের প্রহরী' গল্পের ভুতো আর তার কাটামুণ্ডুর 'নরক দর্শন' খেলায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ মিশে রয়েছে প্রকটভাবে। সার্কাসের মালিকের লোক ঠকানো নরকের খেলায় অন্যতম উপকরণ ভুতো। নরক দর্শন সূত্রে গল্পে এসেছে আরও অনেক বিষয় — কাটামুণ্ডু, জালকুমারী, কুম্ভীপাকের পিশাচ। গল্পে বয়েছে—

> "প্রথম ঘরটা কাটামুণ্ডুর। যে নরকের পাহারদার। যে যমের দূত। যার

কপালে লাল রক্তের ফোঁটা। যার ভয়ঙ্কর দুটো চোখে জিঘাংসা। যার গোঁফ চুঁইয়ে, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ে।

পরের ঘরটা জালকুমারীর। যার শরীর মাকড়শার জাল, মাথা মানুষের। যার লম্বা চুল, টানা চোখ, রাঙা ঠোঁট, কপালে কাচপোকার টিপ। যার দু-চোখে ক্লান্তি, বেদনা আর অসহায়ত্ব।"[১২]

নরকদর্শনের দর্শক, তার পরিবেশ মিলিয়ে দীপেন্দ্রনাথ বর্তমান সময়কেই উপস্থিত করেছেন এই গল্পে। আর এই গল্পের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে দীপেন্দ্রনাথের পুরাণ-ভাবনা।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত গল্পের সুধাময় চরিত্রের মাধ্যম লেখক ধরতে চেষ্টা করেছেন বর্তমান ও তার ইতিহাসকে। মধ্যবিত্তের খণ্ডিত জীবনবোধ ও জীবনচর্চা এবং সমকালের ছন্নছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য গল্পে। একদিকে অস্তিত্বের বিমূঢ় বিপর্যয়, অন্যদিকে স্বপ্নের আর্তি নায়ক সুধাময়ের মধ্যে আমরা পাই। এই গল্পে একই সঙ্গে রয়েছে বিতৃষ্ণ জীবন — অভিমান, সতৃষ্ণজীবন— অনুরাগ। চর্যাকারের তত্ত্ববিশ্বে নতুন মাত্রা খুঁজেছেন দীপেন্দ্রনাথ। উক্ত গল্পে ভাষার ব্যবহার ও থিমের পরীক্ষায় লেখক পাঠকসমাজে তৈরি করেছিলেন বিতর্কের। 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পে সময় ও পরিবেশের চমক গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ে এর ভাষা ও ভঙ্গির নতুনত্বে। সমস্ত গল্পটিকে গল্পকার নিজের ইচ্ছেতেই কেন্দ্রচ্যুত করে দেন। মেতে ওঠেন নতুন শব্দের আরও নতুন রকমের খেলায়; প্রায় স্বেচ্ছাচারী আত্মকথনের মাধ্যমে। আসলে বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকের প্রায় সন্ধিক্ষণে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সংকট ও নিরুপায় অন্ধতাই গল্পের এলোমেলো অবয়বে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে। গল্পে রয়েছে—

"... কোন চ্যাংড়া লিখিয়ে যেন নরক না কী নামে একটা গল্প লিখেছিল। সেই বিস্মৃত বয়সের যুবকটি, সেই সুধাময় হঠাৎ ভাবল তার মুণ্ডু নেই, ধড়টা আছে। সে গল্পের ভুতুড়ে নায়কের সঙ্গে যুবার এইটুকুই তফাত। একজন কবন্ধ, একজন কাটামুণ্ডু। এবং সে নরকের পাহারাদার, আমি পাতালের বন্ধ কফিন। আমি মরতে মরতে ক্লান্ত। অন্ধকার জোনাকির চালাকিতে ক্লান্ত। আহ্, এই অন্ধকার এবং পাতাল, বন্ধ, কফিন।"[১৩]

'চর্যাপদের হরিণী'তে এই যে 'কোন চ্যাংড়া লিখিয়ের' গল্প 'নরক' বলতে দীপেন্দ্রনাথ নিজেরই গল্প 'নরকের প্রহরী'র ভুতোর কথা বলেছেন। পরবর্তী লেখায় নিজেকে ব্যবহার করে গল্পকার এখানে চমক সৃষ্টি করেছেন। বাংলাভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্যে চর্যাপদের হরিণী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সেই হরিণী যে গল্পের শরীরে একটি প্রতীক হয়ে ব্যবহৃত হতে পারে তা অনায়াসে দেখালেন দীপেন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে।

সূত্রনির্দেশ

১. *গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,* অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), একুশ শতক, কলকাতা সম্পাদকের কথা অংশ।

২. *কথাজিজ্ঞাসা,* বীতশোক ভট্টাচার্য, *দীপেন্দ্রনাথের রচনা ঃ ভাষায় মতাদর্শ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃঃ ২১৫

৩. *উপন্যাস সমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,* অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), একুশ শতক, কলকাতা, পৃঃ ২৩২

৪. *গল্পসমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,* অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা), একুশ শতক, কলকাতা পৃঃ ৪২৮

৫. তদেব, পৃঃ ৪৪০

৬. তদেব, পৃঃ ৩০৭

৭. তদেব

৮. তদেব

৯. তদেব, পৃঃ ২৭৫

১০. তদেব, পৃঃ ২৭৬

১১. তদেব, পৃঃ ৩৩৩

১২. তদেব, পৃঃ ২৩৩

১৩. তদেব, পৃঃ ২৫১

উপসংহার

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই সঙ্গে চর্চার ও চর্যার। তাঁর গল্প-উপন্যাস-রিপোর্টাজ পাঠ করে একথাই আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত হয়।

দীপেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধকালীন অবস্থা এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবী নানা সংকটে জর্জরিত। ভারতবর্ষের সংকট তখন আরো গভীর। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভারতকে দুভাগ করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলো সোনার বাংলা। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অবস্থা আরো ভয়ংকর। এই সংকটময় পরিস্থিতিতেই দীপেন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠেছেন। তাঁর সাহিত্যেও এই সময়ের প্রতিফলন স্পষ্ট।

রাজনৈতিক দিক থেকে দীপেন্দ্রনাথ বামপন্থী ছিলেন। জীবনে ও সাহিত্যে তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী। বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্র ছাড়া মুক্তি নেই। সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতায় সমাজ যখন কম্পমান তখন পুরনো ফর্ম-ভাষা তাকে গ্রহণ করতে প্রায় অপারগ। সে সময় প্রয়োজন হলো নতুন ভাষা ও ফর্মের। এই ঐতিহাসিক ক্ষণেই দীপেন্দ্রনাথ লিখলেন— 'জটায়ু', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'স্বয়ম্বর সভা', 'উৎসর্গ' ইত্যাদি গল্প। প্রচলিত রীতিকে ভেঙে বেরিয়ে এলেন তিনি। পুরাণ-চিত্রকল্পকে আধুনিক ভাবনায় জারিত করে পরিবেশন করলেন। তাঁর পরবর্তী বেশ কিছু গল্পকারও তাঁর পথেই হাঁটছেন জ্ঞানে-অজ্ঞানে।

আজ একুশ শতকেও আমরা রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ সার্বিক দিক থেকে এক ভয়ঙ্কর সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে। এই পরিস্থিতির ইঙ্গিত ছিল দীপেন্দ্র-সাহিত্যে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এতোদিন এড়িয়ে চলেছি তাঁকে। এখনো সময় আছে— দীপেন্দ্র সাহিত্যে মনোনিবেশ করেই আমরা এগোতে পারব বহু দীর্ঘ পথ। আর সেজন্যই দীপেন্দ্র-জীবন ও দীপেন্দ্র সাহিত্যচর্চা এতো জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১. চক্রবর্তী অনিশ্চয় (সম্পা), *গল্প সমগ্র দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,* একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা ৭৩

২. চক্রবর্তী অনিশ্চয় (সম্পা), *উপন্যাস সমগ্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,* একুশ শতক, মার্চ ২০০৮, কলকাতা ৭৩

সহায়ক গ্রন্থ

১. ঈগলটন টেরী, *মার্কসবাদ ও সাহিত্য সমালোচনা,* দীপায়ন, জুলাই ২০০৮, কলকাতা ০৯

২. কর শিশির, *বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী,* আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯২, কলকাতা ৫৪

৩. ঘোষ নির্মল, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৪০১, কলকাতা ০৯

৪. ঘোষ কুমার সুনীতি, *নকশালবাড়ি একটি মূল্যায়ন,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, আগস্ট ২০১০, কলকাতা ০৪

৫. চট্টোপাধ্যায় অনুনয়, *মার্কস ও মার্কসবাদ,* এন.ই. পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০৯, কলকাতা ৩৫

৬. চক্রবর্তী শ্যামল, *৬০-৭০ ছাত্র আন্দোলন,* এম. বি.এ., বইমেলা ২০১১ কলকাতা ৭৩

৭. চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ, *দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী,* আনন্দ, জুন ২০১০, কলকাতা ০৪

৮. চক্রবর্তী নন্দ সাবিত্রী, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ঃ মূল্যবোধের সংকট,* পুস্তক বিপণি, জুন ২০০৪ কলকাতা ০৯

৯. চৌধুরী শম্পা (সম্পা), *প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প স্বাধীনতার আগে ও পরে,* রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা ০৯

১০. ত্রিপাঠী অমলেশ, *ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি,* আনন্দ, মার্চ ২০১২, কলকাতা ০৪

১১. ত্রিপাঠী অমলেশ, *ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব,* আনন্দ, জুন ২০১০, কলকাতা ১৪

১২. দাস অরূপকুমার, *ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথা সাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১২, কলকাতা ০৯

১৩. দাশ নির্মল, *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ,* অক্ষর পাবলিকেশনস্, বইমেলা ২০১০, ত্রিপুরা ০১

১৪. দত্তগুপ্ত শোভনলাল, *সমাজ, মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল নির্বাচিত প্রবন্ধ,* সেরিবান, ডিসেম্বর ২০০৯, কলকাতা ৩২

১৫. দাশ শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প,* দেজ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১২, কলকাতা ৭৩

১৬. দত্ত বিজিতকুমার, *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ২০০০, কলকাতা ২০

১৭. নাম্বুদিরিপাত ই.এম.এস., *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস*, সেপ্টেম্বর ২০০৬, কলকাতা ০৯

১৮. পাল শ্রাবণী (সম্পা), *বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক*, পুস্তক বিপণি, মে ২০০৮, কলকাতা ০৯

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায় হিমবন্ত, *অশ্বমেধের ঘোড়া ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জুলাই ২০১১, কলকাতা ০৯

২০. বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, *কালজয়ী বাংলা গল্পকারগণ পুনর্বিচার*, প্রজ্ঞাবিকাশ, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা ০৯

২১. বিশ্বাস মনোহরমৌলি, *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা*, বাণীশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা ০৯

২২. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, *বাংলা উপন্যাস ঃ দ্বান্দ্বিক দর্পণ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৬, কলকাতা ২০

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ন্ত, *বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দুই স্থপতি*, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২৫ শে বৈশাখ ১৪১৯, কলকাতা ০৯

২৪. ভট্টাচার্য বীতশোক, *কথাজিজ্ঞাসা*, এবং মুশায়েরা জানুয়ারি ২০০৪, কলকাতা ৭৩

২৫. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু ও অন্যান্য (সম্পা), *বাংলা প্রগতি সাহিত্য সময় ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০১১, কলকাতা ০৯

২৬. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু, *প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস*, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা ২০০৬, কলকাতা ০৯

২৭. ভট্টাচার্য জ্যোতি, *নন্দন-তত্ত্ব ও মার্কসবাদ*, অগ্রণী বুক ক্লাব, বইমেলা ১৯৯৬, কলকাতা ১৪

২৮. ভট্টাচার্য উৎপল, *মুখোমুখি বিনয় মজুমদার*, কবিতীর্থ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, কলকাতা ০৯

২৯. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পা), *পঞ্চাশের দশকের কথাকার*, প্রজ্ঞাবিকাশ, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা ৩৭

৩০. মুখোপাধ্যায় তরুণ, *বাংলা ছোটগল্প ঃ পর্ব-পর্বান্তর*, অর্পনা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা ০৯

৩১. মোদক রীতা, *কথাপ্রগতি ঃ দীপেন্দ্রনাথ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মহালয়া ২০০৪, কলকাতা ০৯

৩২. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পা), *তারাশঙ্কর ঃ দেশ কাল সাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০১২, কলকাতা ০৯

৩৩. মুখোপাধ্যায় সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, এন.বি.এ. জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা ৭৩

৩৪. মিত্র সরোজমোহন, *বাংলা ছোটোগল্প বিচিত্রা মননে ও বিশ্লেষণে*, প্রজ্ঞা বিকাশ, জুলাই ২০০৮, কলকাতা ০৬

৩৫. রায় ধনঞ্জয় (সম্পা), *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ, জানুয়ারি ২০১০, কলকাতা ১৪

৩৬. লাহিড়ী কার্তিক, *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা ০৬

৩৭. লাহিড়ী অবনী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা*, সেরিবান, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা ৩২

৩৮. সিকদার অশ্রুকুমার, *সাহিত্যের সমাজ*, পুস্তক বিপণি ডিসেম্বর ২০০৫, কলকাতা ০৯

৩৯. সিকদার অশ্রুকুমার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৮, কলকাতা ০৬

৪০. সরকার তারক, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ*, অরুণা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, কলকাতা ০৯

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), আফিফ ফুয়াদ (সম্পা), জুলাই-সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭

২. *পরিচয়*, (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা), ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৭৯